জ্ঞান ও বিজ্ঞান

49তম বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী, 1996

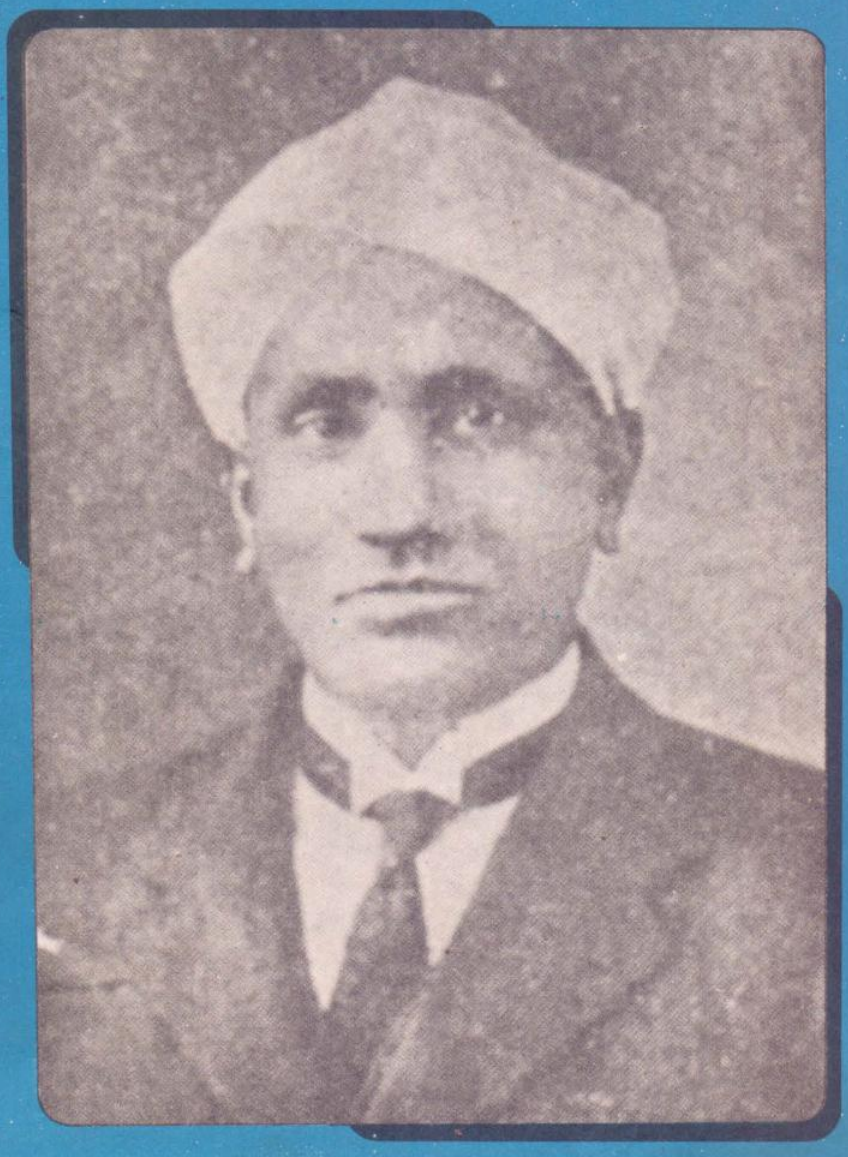

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

লেখকদের প্রতি নিবেদন

❖

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 2000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার ,সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে.মি. কিংবা এর গুণিতকের (16 সে. মি. 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ও ফীচার-এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

** বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে প্রতি ইংরাজী মাসের দ্বিতীয় শনিবার বেলা 3টায় নবীন ও প্রবীণ বিজ্ঞান লেখকদের "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" এর আসর বসে । সকল বিজ্ঞান লেখক আমন্ত্রিত ।*

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

49তম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা | ফেব্রুয়ারী, 1996

ঃ উপদেষ্টা ঃ

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

ঃ সম্পাদনা সচিব ঃ

রতনমোহন খাঁ

ঃ সম্পাদক মণ্ডলী ঃ

অনাদিনাথ দাঁ, অপরাজিত বসু, কমলকুমার চক্রবর্তী, জয়ন্ত বসু, নিমাই দত্তগুপ্ত, ভোলানাথ দত্ত, শশধর বিশ্বাস, শ্যামল চক্রবর্তী, শৈবাল গুহ, সত্যব্রত দাশগুপ্ত, সত্যরঞ্জন পাণ্ডা, সুমিত্রা চৌধুরী, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মূল্য ঃ দশ টাকা

ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা–700 006

ফোন ঃ 555-8417

সূ চী প ত্র

সম্পাদকীয়

❐ অনন্যতা ও নিঃসঙ্গতা 47

❐ বোস সুপারকনডেনসেট • সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র 48

❐ মানসিক রোগ এবং তরুণ সমাজ • সুধাংশু পাত্র 50

❐ অধ্যাপক জে. বি. এস হলডেনের রচনা জল ও লবণের বিষক্রিয়া • অনুবাদ – গোপাল ভট্টাচার্য 54

❐ আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা • চন্দন তিলক ভূঞ্যা 56

❐ আবিষ্কারের কাহিনী • অনিল দাস 59

❐ সিদ্ধান্ত • নির্ম্মল কুমার প্রামাণিক 61

❐ সেভেরো অচোয়া (1905–) • দেবব্রত দাশগুপ্ত 66

❐ সুন্দরবন কুসংস্কার • নকুল চট্টোপাধ্যায় 70

কি শো র বি জ্ঞা নী র আ স র

❐ বাতাস যদি না থাকত • কমল চক্রবর্তী 71

❐ শ্যাম্পু কতটা নিরাপদ ? • কমল কুমার সেনগুপ্ত 75

❐ গিরগিটি • ইন্দ্রনীল সান্যাল 76

❐ দূষিত জল পরিশোধনে অবায়বীয় পদ্ধতি • অর্ণব কুমার দে 79

❐ কালবৈশাখীর ঝড় • সত্যজিৎ শংকর সিংহ 80

❐ এক কাঠার জমিদার • তপনকুমার দোলুই 83

❐ মজার সংখ্যা নয় • সত্যরঞ্জন পাণ্ডা 84

❐ প্রশ্ন ও উত্তর • জয়শ্রী দত্ত 88

❐ শ্বসন • অরিজিৎ দাস অধিকারী 88

❐ বিজ্ঞান সংবাদ • শৈবাল গুহ 89

❐ করে দেখ • অরিজিৎ দাস অধিকারী 89

বি বি ধ

❐ পুস্তক পরিচয় • হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 91

❐ শোক সংবাদ • প্রতিবেদক অপরাজিত বসু 91

❐ চিঠিপত্র • সুরজিৎ সেনগুপ্ত 92

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন (বিজ্ঞান দিবস স্মরণে)

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কার্যকরী সমিতি (1995 – 1998)

ঃ সভাপতি ঃ

অনাদিনাথ দাঁ

ঃ সহ-সভাপতি ঃ

জয়ন্ত বসু, নরেশচন্দ্র দত্ত, নিমাই দত্তগুপ্ত, রতনমোহন খাঁ।

ঃ কর্মসচিব ঃ

সুমিত্রা চৌধুরী

ঃ সহযোগী কর্মসচিব ঃ

অরুণাভ মিশ্র, তপন সাহা, দেবাশিস পাল

কোষাধ্যক্ষ ঃ অপরাজিত বসু

ঃ সদস্য ঃ

উৎপল দত্ত, কমলকুমার চক্রবর্তী, কল্যাণ কুমার রায়, তুষার কান্তি ঘোষ, দেবেশ দাস, দুলালচন্দ্র পাত্র, দীপা সরকার, ভোলানাথ দত্ত, মণি রায়, রামদুলাল নন্দী, শশধর বিশ্বাস, শ্যামল চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র ঘোষ, শৈবাল গুহ, সত্যরঞ্জন পাণ্ডা, সত্যব্রত দাশগুপ্ত ও হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ঃ উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ

অমরনাথ ভাদুড়ী, অশোক ঘোষ, অশোক দাশগুপ্ত, অশেষ প্রসাদ মিত্র, অসীমা চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, গোপাল ভট্টাচার্য, জগদীশ ভট্টাচার্য, তপন মুখোপাধ্যায়, তৃষিত রায়, দিলীপকুমার বসু, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ সাহা, বিকাশ সিংহ, বিশ্বরঞ্জন নাগ, বিনায়ক দত্তরায়, ভাস্কর রায়চৌধুরী, প্রশান্ত রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রমেন্দ্র কুমার পোদ্দার, রথীন্দ্রনারায়ণ বসু, শঙ্কর সেন, সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়।

- বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্ত সমূহ পরিষদের বা সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণত বিবেচ্য নয়।
- বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

অনন্যতা ও নিঃসঙ্গতা

সূর্যকেন্দ্রিক সৌরমণ্ডল মহাবিশ্বে কি অনন্য ? প্রাণের লহরী লীলায় পৃথিবী কি মহাবিশ্বে নিঃসঙ্গ ? সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানব-মনে এ প্রশ্ন দিয়ে চলেছে দোলা। তাই দেশে দেশে ছড়িয়ে আছে দ্যুলোক, ভূলোক, নরক নিয়ে কত রূপ কথা কত আজব উপাখ্যান। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে, মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে, জীব বিজ্ঞানীদের কাছে এ প্রশ্ন যেমন পীড়াদায়ক তেমনি রোমাঞ্চকর। তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় সমাধান প্রায় অসম্ভব। অনন্যতা ও নিঃসঙ্গতার অনুকূলে সিদ্ধান্তে আসতে হলে একদিকে চাই সৌরমণ্ডল সৃষ্টির পরিস্থিতি বিষয়ক এবং প্রাণের স্ফূরণের পরিবেশ বিষয়ক সন্দেহাতীত ও তর্কাতীত তত্ত্ব আর অন্যদিকে চাই কোটি কোটি তারার মাঝে সূর্য ব্যতীত কোন তারাকে কেন্দ্র করে অনুরূপ পরিস্থিতি ও পরিবেশ উদ্ভবের অসম্ভব্যতার তত্ত্ব। মহাবিশ্বের বিশালতা, বিচিত্রতা এবং আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা এ তত্ত্ব নির্ধারণে অলঙ্ঘনীয় অন্তরায়। প্রতিকূল মতবাদে তত্ত্ববিজ্ঞানীদের সামনে আছে সম বাধা। আবার ভবিষ্যতে কোন তারাকে কেন্দ্র করে কি গড়ে উঠবে তারকিত মণ্ডল এবং ঐ মণ্ডলের কোন পরিবারে কি জাগাবে প্রাণের স্পন্দন ? এরূপ নানা জটিলতার পাশে তত্ত্বীয় বিজ্ঞান হয়ে আছে বদ্ধ।

প্রয়োগ বিজ্ঞানীরা তত্ত্বের চুলচেরা বিচারকে পাশে রেখে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে চান কোন ছায়াপথে কোন তারকার চারপাশে ঘুরছে কি কোন গ্রহ, দূর-দূরান্তে ঐরূপ কোন গ্রহে আছে কি প্রাণের অস্তিত্ব ? এ চিন্তা-ভাবনা নিয়েই হাবল মহাকাশ প্রকল্প ও সংকেত গ্রহণ প্রকল্প। দুঃখের বিষয় হাবল মহাকাশ দূরবীন বা রেডিও দূরবীনের চোখে ধরা পড়ে নি কোন ভিন্ তারকিত গ্রহ, অতিসংবেদনশীল গ্রাহক যন্ত্রে গৃহীত হয়নি ভিন্ গ্রহের প্রাণী প্রেরিত সংকেত।

সম্প্রতি সানফ্রান্সিস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিওফ্রে মারসি এক চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের দাবিদার। মারসি ও তাঁর সহযোগীদের জোরালো দাবি হচ্ছে, তাঁরা দুটি তারার সন্ধান পেয়েছেন, যাদের গ্রহ আছে। একটি তারা হল কন্যারাশিতে আর অন্যটি সপ্তর্ষিমণ্ডলে। কন্যারাশির 70তম তারার চারপাশে ঘুরছে এক গ্রহ, যার আয়তন সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির আট গুণ এবং উপরিতলের তাপমাত্রা প্রায় 185^{0}F। অপরটি সপ্তর্ষিমণ্ডল বা বৃহৎ ঋক্ষের 47তম তারার গ্রহ। এই গ্রহ ভরে বৃহস্পতির তিন গুণ এবং কেন্দ্রকের চারপাশে একবার ঘুরতে সময় লাগে 3 বছরের বেশি। এই দুই ভিন্ তারার গ্রহ পৃথিবী থেকে প্রায় 35 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। মারসির বিশ্বাস ঐ দুই গ্রহে জলের প্রবাহ আছে এবং প্রাণের সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল।

তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের মতে প্রাণের স্ফূরণের জন্য প্রাথমিক শর্তগুলি হল – একটি তারার ভরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাণসঞ্চারী গ্রহের ভর হতে হবে এবং নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকতে হবে। সূর্য যদি আর দশগুণ বড় হত, তবে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ঘটত না, কারণ অধিক পরিমাণে অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে প্রাণ বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিত। আবার পৃথিবীর কক্ষপথের যদি সামান্য হেরফের হত, তাহলে তাপমাত্রা হত খুব কম বা খুবই বেশি যা প্রাণের অনুকূল নয়। মারসির গ্রহদ্বয় এসব শর্ত কি পূরণ করবে ? অন্যদিকে মারসির আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও দূরবীন, হাবল মহাকাশ দূরবীন বা অধিকতর শক্তিশালী দূরবীনের চোখ ফেরান হয়েছে কন্যারাশি ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে, কিন্তু ইতিবাচক কিছুতে প্রয়োগীদের ভরে নি হাত।

এত সব বৈপরিত্য সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা ভাবছেন কল্পনাতীত মহাবিশ্বে কোটি কোটি নক্ষত্র মাঝে থাকতেও পারে তারকিত গ্রহমণ্ডল, থাকতেও পারে প্রাণের রোমাঞ্চের শিহরণ। ঐ সব প্রাণীদের তুলনায় পৃথিবীর মানুষ হয়ত পড়ে আছে প্রস্তর যুগে, তাই ধরতে পারছেনা ওদের স্থাপিত মহাজাগতিক দূরাভাষের সংকেত বার্তা।

বোস সুপারকনডেনসেট

সূর্যেন্দু বিকাশ করমহাপাত্র*

বোস সুপারকনডেনসেট তৈরি সফল হওয়ায় পদার্থ জগতের গবেষণায় এক নূতন দিগন্ত খুলে গেছে। পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতে এই অবস্থার পদার্থের সাহায্যে মৌলিক নিত্য সংখ্যার মান আরও নিখুঁত ভাবে মাপা যাবে ; কোয়াণ্টাম তত্ত্বের অনেক পূর্বানুমান যা এখনও পরীক্ষিত হয়নি, তাদের পরীক্ষা সম্ভব হবে।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের জন্মশতবর্ষ ও বোসের আবিষ্কার বোস-স্ট্যাটিস্টিকসের সত্তর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এসময় বোস-স্ট্যাটিস্টিকস্ তত্ত্বের পূর্বানুমানের পরীক্ষালব্ধ প্রতিপাদন নিঃসন্দেহে একটু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও বোসের প্রতি বিজ্ঞানী সমাজের সশ্রদ্ধ উপহার হিসেবে বিবেচিত হ'বে।

অনেকেই জানেন যে 1924 খৃস্টাব্দের অগাস্ট সংখ্যার Zeits fur Physiq পত্রিকায় প্রকাশিত বোসের বিখ্যাত ঐ গবেষণা পত্রের সঙ্গে আইনস্টাইন তাঁর মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিলেন যে 'বোসের এই তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ। গ্যাসের জন্য এই তত্ত্ব প্রয়োগ করার যথার্থতা পরে আলোচনা করব।'

আইনস্টাইন পরে তাঁর আলোচনায় পূর্বানুমান করেছিলেন যে উপযুক্ত উষ্ণতায় পদার্থ বোসনের মত আচরণ করে অতি ঘনীভূত হ'তে পারে। এই ঘনীভবনকে বোস আইনস্টাইন ঘনীভবন আখ্যা দেওয়া হয়। এই পূর্বানুমান পরীক্ষায় প্রতিপন্ন করা সহজ নয়। $O^{o}K$ বা $-273^{o}C$ উষ্ণতা লাভ করা স্বভাবত অসম্ভব। তবে এক কেলভিনের হাজার কোটি ভাগের একভাগ উষ্ণতায় নামতে পারলে এই পূর্বানুমান হয়ত পরীক্ষায় প্রতিপন্ন করা যায়। নিম্নতাপমাত্রা সৃষ্টির প্রযুক্তি এত দুরূহ যে গত প্রায় 70/75 বছর ধরে এই প্রযুক্তির গবেষণায় পুরোপুরি সাফল্য পাওয়া যায়নি।

2.19 কেলভিন নিম্ন উষ্ণতায় বোস-ঘনীভবনের নিদর্শন পাওয়া গেল সুপার ফ্লুইড হিলিয়াম-4 নিউক্লিয়াসে। ঐ উষ্ণতার নীচে He-4 বোসনের মত আচরণ করে তরল হিলিয়াম তখন সান্দ্রতা হারিয়ে ফেলে। সান্দ্রতা থাকে বলে কোন তরল প্রবাহের বিভিন্ন অঞ্চলে গতিবেগ ভিন্ন থাকে। সান্দ্রতাহীন অবস্থায় তরলের নিউক্লীয়নগুলি একজোটে এক গতিবেগে চালিত হয়। ফলে তা আধারের দেয়ালের বাধা না মেনে সুপার ফ্লুইড বা অতি বহমান হয়ে পড়ে।

হিলিয়াম-4 তরলের চারটি নিউক্লিয়নই ফের্মিঅন অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের স্পিন + ½ অথবা – ½। হিলিয়ামের চারটি নিউক্লিয়ন একজোট হলে স্পিন 0 অথবা এক হয় ও তখন তা বোসনের মত আচরণ করে। নীচু তাপমাত্রায় পরমাণুর যথেচ্ছ গতি তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ছড়িয়ে পড়তে দেয় না। ফলে He-4 এক অবস্থায় বোসনের মত ঘনীভূত হয়ে অতি বহমানতা ধর্ম লাভ করে।

He-3 এর বিজোড় নিউক্লীয়ন তখনও ফের্মিঅনের মত আচরণ করে।

1974 খৃস্টাব্দে 27×10^{-4} কেলভিনের চেয়ে কম উষ্ণতা লাভ করা সম্ভব হয়। ঐ উষ্ণতার নীচে দুটি He-3 নিউক্লিয়াস জোড় বেঁধে অতি বহমান হয়ে পড়ে। জোড় বাঁধলে ঐ জুড়ির ভর সংখ্যা ছয়ের ছয়টি ফের্মিঅন জোড় সংখ্যা হওয়ায় স্পিন সংখ্যা 0 বা এক হয় ও ঐ জুড়ি বোসনের মত আচরণ করে।

অতিপরিবাহিতাও বোস-ঘনীভবনের অন্য এক নিদর্শন। এই অবস্থায় নিম্ন তাপমাত্রায় ধাতু বৈদ্যুতিক রোধ হারিয়ে অতি পরিবাহী হয়ে পড়ে। তাই 7.26 কেলভিনে সীসা, 3.69 কেলভিনে টিন, 1.14 কেলভিনে অ্যালুমিনিয়াম ও 0.79 কেলভিনে জিঙ্ক অতিপরিবাহী অবস্থা পায়। তরল অক্সিজেনের উষ্ণতায়ও কিছু কিছু যৌগিক পদার্থের অতি পরিবাহিতা ধরা পড়েছে।

পরিবাহী ইলেকট্রনের অতিবহমানতা অতি-পরিবাহিতার কারণ বলা যায়। নীচু তাপমাত্রায় দুটি ইলেকট্রন জুড়ি বেঁধে চলে বলেই তার ½ সংখ্যক স্পিনে মিলে 0 বা এক হয়। ফলে এরকম পদার্থ বোসনের মত আচরণ করে।

বোস-ঘনীভবনের এই বিস্ময়কর আচরণের মূলে এই ঘটনাই কাজ করে যে He-4, জোড়া He-3 ও ইলেকট্রন জুড়ি হল বোসন ও তারা বোস স্ট্যাটিস্টিক্স্ মেনে চলে।

* বি জি – 39, বিধান নগর, কলিকাতা-91

অবশেষে কোলোরেডো, বোলডারের জয়েন্ট ইনস্ট্যুট অব ল্যাবরেটরী অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের (JILA) বিজ্ঞানী এম. এইচ অ্যান্ডারসন, জে. আর. এনশার, সি. ই. উইএমেন এবং ই. এ. কর্ণেল নিম্নতম উষ্ণতা 170×10^{-9} কেলভিন সৃষ্টি করে 1995 খৃস্টাব্দের 5 জুন আইনস্টাইনের পূর্বানুমিত সুপারকনডেনসেট পদার্থ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন। এই অবস্থায়

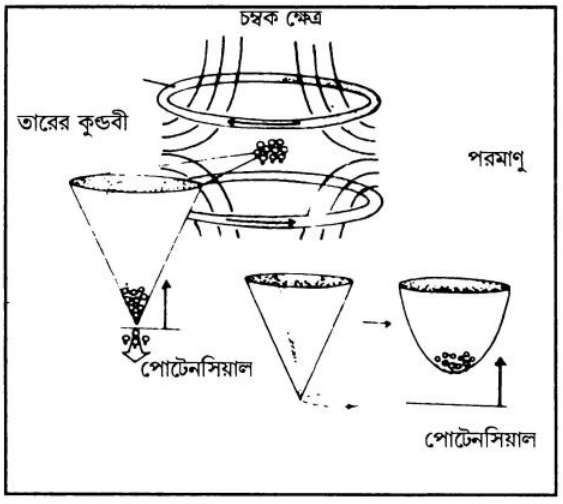

সাধারণ বিপরীতমুখী চুম্বকীয় ফাঁদের কেন্দ্রের শূন্য চুম্বক ক্ষেত্রের ছিদ্র পথে পরমাণু বেরিয়ে যেতে পারে। পরে এই time orbiting potential (ToP) ফাঁদে চুম্বক ক্ষেত্রের কেন্দ্রে আবর্তিত হয় ও ছিদ্র পথ বন্ধ (ডাইনে) হয়ে যায়।

রুবিডিয়াম-87 এর প্রায় 2000 পরমাণু 100 মাইক্রোমিটার স্থানে আবদ্ধ থেকে একটি সুপার আটমের মত আচরণ করে। এতগুলি পরমাণু মিলে এ নীচু তাপমাত্রায় বোসনের মত আচরণ করে। এই আবিষ্কার বর্তমান শতকের অন্যতম দুরূহ আবিষ্কার হিসেবে ও বোস-স্ট্যাটিস্টিকসের সফলতম পরীক্ষা হিসেবে গণ্য হতে পারে।

মাত্র 15 সেকেণ্ডের জন্য হলেও বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে ঐ শীতলতম উষ্ণতা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। ঐ উষ্ণতা সৃষ্টিতে যে পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে তা হল পরিচিত পদ্ধতিতে পদার্থের উষ্ণতা যথেষ্ট কমিয়ে তা time orbiting potential যুক্ত চুম্বকীয় ফাঁদে (চিত্র) আবদ্ধ রেখে লেসার রশ্মির সাহায্যে অধিকতর ঠাণ্ডা করা হয়। বিশ্বের শীতলতম এই উষ্ণতা হল 170×10^{-9} কেলভিন।

বোস-স্ট্যাটিস্টিকসের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য বোসের জন্মশতবর্ষ শেষে বোস ও আইনস্টাইনের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

পদার্থের এই অতিঘনীভূত অবস্থাকে পদার্থের শূন্যতম অবস্থা ও বোসোনিয়াম নামে অভিহিত করা যায়।

বোস সুপারকনডেনসেট তৈরি সফল হওয়ায় পদার্থ জগতের গবেষণায় এক নূতন দিগন্ত খুলে গেছে। পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতে এই অবস্থার পদার্থের সাহায্যে মৌলিক নিত্য সংখ্যার মান আরও নিখুঁতভাবে মাপা যাবে ; কোয়াণ্টাম তত্ত্বের অনেক পূর্বানুমান যা এখনও পরীক্ষিত হয়নি, তাদের পরীক্ষা সম্ভব হবে।

এখনও পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বই পরীক্ষিত সত্য নয় ; স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিসাম্যের কীভাবে ক্ষয় ঘটে, স্থূল সত্ত্ব অবস্থার পদার্থের কোন ক্রিয়ায় ক্ষয় হয়, এই নূতন আবিষ্কার থেকে তাদের তাৎপর্য বোঝা সম্ভব হবে।

সবচেয়ে বিস্ময়ের হল, প্রায় সত্তর বছরের পুরাতন একটি তত্ত্বের পরীক্ষমূলক প্রতিপাদনে বিজ্ঞানের এই সৃষ্টিশীলতা মানুষের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল দিকচিহ্ন হিসেবে গণ্য হবে।

নিমাই কুমার ঘোষ-এর

কেদ্রায়নে সমগ্র বিজ্ঞান – ৮৲
আইনস্টাইনীয় বিজ্ঞানের বিশাল বিতর্ক – ১০৲
সৃষ্টিকর্তা একক ক্ষেত্রতত্ত্ব – ২৭৲
সেণ্টারিজমে ধর্ম বিজ্ঞান দলহীন গণতন্ত্র – ৫৲

আত্মবিজ্ঞান ঃ এম. টি ৩৪/১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

মানসিক রোগ এবং তরুণ সমাজ

সুধাংশু পাত্র*

আজকে সারাবিশ্বের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমরাও প্রত্যক্ষ করছি আজকের হতাশাগ্রস্ত তরুণ সমাজকে। তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও ধীরে ধীরে বাড়তে দেখছি আমরা। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা আত্মহত্যা করে বসে তাঁরা স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত এবং পারিবারিক অথবা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতি তাকে স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হতে সাহায্য করেছে। সামাজিক অবক্ষয়ের আর এক করুণ ও মর্মস্পর্শী চিত্র।

সাম্প্রতিক কালের মানসিক রোগ সংক্রান্ত সমীক্ষাগুলো দেখলে শিউরে উঠতে হয়। কী স্বদেশের, কী বিদেশের সর্বত্রই মানসিক রোগীদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। আরও দুঃখের কথা, বয়স্থ অপেক্ষা তরুণদের মধ্যেই ঐ রোগের প্রকোপ বেশি।

মানসিক রোগ নানা ধরনের। হীনমন্যতা, আবেগে চালিত হওয়া-সাধারণ কথায় উচ্ছৃঙ্খলতা ও উন্মাদনা, তরুণদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ এবং লেখপড়ায় অমনোযোগীতা, নেশার বশবর্তী হওয়া, এমনকি শুচিবায়ু গ্রস্তরাও মানসিক রোগীদের পর্যায়ে পড়ে। সবচেয়ে মারাত্মক স্কিজোফ্রেনিয়া বা সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)। একটা সমীক্ষা থেকে জানা গেল, একমাত্র ভারতেই এক কোটি তরুণ-তরুণী স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। অপরাপর দেশের চিত্রও বড় করুণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রথম বিশ্বের দেশেও।

চলতি কথায় আমরা যাদের পাগল বলি, স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তরা তাই। কথাবার্তা এবং কাজকর্মে অসঙ্গতি, স্থবিরতা, সন্দেহ প্রবণতা, আক্রমণাত্মক মনোভাব, দিবাস্বপ্ন বা অলীক কল্পনাবিলাস ইত্যাদি যাদের মধ্যে প্রকাশ পায় তাদেরই স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ধরা হয়। স্কিজোফ্রেনিয়ার প্রকৃত অর্থ এবং লক্ষণ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীদের সবাই একমত নন। নানা সময়ে নানা বিজ্ঞানী রোগটার এক একটা সংজ্ঞা খাড়া করেছেন। কিন্তু সর্বসম্মত কোন সংজ্ঞা আজও আসেনি বলা যেতে পারে। মোটামুটিভাবে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, স্কিজোফ্রেনিয়া অর্থে "বিচ্ছিন্ন মানসিকতা" বা খন্ডিত মানসিকতা"।

মানসিক রোগী চিরকাল সমাজে আছে, থাকবেও। আগে ওদের বলা হতো পাগল। চিকিৎসাও বড় একটা ছিলনা। আমাদের দেশে মনে করা হতো, মাথা গরম হলে বিকৃতি আসে। তাই ঠান্ডা জল, পুকুরের পাঁক, ঠান্ডা তেল ইত্যাদি রোগীর মাথায় চাপানো হতো।

পাগলদের নিয়ে প্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণা চালিয়েছিলেন মনোবিজ্ঞানী ক্রেপলিন। 1883 খৃস্টাব্দে রোগটির নামকরণ করেন "ডিমেন্সিয়া প্রেক্‌কস"। লাতিন ডিমেন্সিয়া অর্থে বুদ্ধিভ্রংশ এবং প্রেক্‌কস অর্থে অকালপক্ক। নামকরণ যাই হোক না কেন ক্রেপলিন উল্লেখ করেন, রোগটা বংশগত এবং দুরারোগ্য। কিশোর বয়সে রোগটা আক্রমণ করে।

ক্রেপলিনের পরে গবেষণা করেন বিশিষ্ট মনোবিদ "ইউজেন ব্লোয়ার"। তিনি দীর্ঘকাল এ বিষয়ে গবেষণা করেন এবং ক্রেপলিনের মতামতকে যাচাই করেন। ব্লোয়ারই নামকরণ করেছিলেন স্কিজোফ্রেনিয়া বা বিচ্ছিন্ন মানসিকতা। ক্রেপলিনের সিদ্ধান্তকেও তিনি পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি। উল্লেখ করেন রোগটি বংশগত হলেও হতে পারে, তবে অন্যান্য কারণেও হয়। দুরারোগ্য নয়, উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে সারিয়ে তোলা যায়। অপরদিকে তিনি আরও উল্লেখ করেন, কেবল কিশোর বয়সে নয় – যে কোন বয়সে রোগটা আক্রমণ করতে পারে। স্কিজোফ্রেনিয়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন – মনন, কামনা ও বাসনা, অনুভূতি ও কাজকর্মে বাস্তবের সঙ্গে অসঙ্গতি দেখা দিলেই স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ধরা হবে।

স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের কারণ অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন। এক একজনের এক এক রকমের ব্যাখ্যা। এখানে মাত্র তিন জনের তিনটি মত উদ্ধৃত করা গেল।

কলম্যানের মতবাদ ঃ

মনোবিজ্ঞানী কলম্যানের মতে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগটা বংশগত। অর্থাৎ পিতা কিংবা মাতা উভয়ের যে কোন একজন ঐ রোগে আক্রান্ত হলে তাদের সন্তান সন্ততিরাও এই রোগে আক্রান্ত হয়। কলম্যান সমকোষী যমজদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

* পোঃ - কালিন্দী, জেলা মেদিনীপুর।

এই মতের বিরোধিতাও করেছেন কেউ কেউ। যাঁরাই বিরোধিতা করেছেন, তাঁরাই কলম্যানের মত যমজদের উপর সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। বাস্তবেও দেখা যায় পাগল পিতা কিংবা মাতার সবগুলি সন্তান স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়না। তবে এও দেখা গেছে, সন্তানদের দু-একজনের মধ্যে রোগটি অবশ্যই প্রকাশ পায়। পুরুষানুক্রমেও রোগটিকে প্রকাশ পেতে দেখা গেছে। অতএব কলম্যানের মতবাদকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর ঐখানেই সামাজিক দুশ্চিন্তা। বংশ পরম্পরায় যদি স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং পরিবেশের অসঙ্গতিতে নতুন নতুন স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর জন্ম হয় তাহলে কয়েক প্রজন্ম পরে মানব সমাজের অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে ? ভাবতেই যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হচ্ছে।

হলিংশেড এবং রেডলিচের মতবাদ ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই মনোবিজ্ঞানী হলিংশেড এবং রেডলিচের মতে স্কিজোফ্রেনিয়ার মূলে আছে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক কতকগুলো কারণ। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, সমাজে ধনী অপেক্ষা মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ রোগের প্রকোপ আনুপাতিক হারে অনেক বেশি।

উপরোক্ত দুই মনোবিজ্ঞানীর অভিমতকে বিশ্লেষণ করলে বলতে হয়, আর্থিক অসচ্ছলতাই অনেককে স্কিজোফ্রেনিয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সমাজে ধনী ক'জন ? আজকে সারাবিশ্বের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমরাও প্রত্যক্ষ করছি আজকের হতাশাগ্রস্ত তরুণ সমাজকে। তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও ধীরে ধীরে বাড়তে দেখছি আমরা। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা আত্মহত্যা করে বসে তারা স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত এবং পারিবারিক অথবা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতি তাকে স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হতে সাহায্য করেছে। সামাজিক অবক্ষয়ের আর এক করুণ ও মর্মস্পর্শী চিত্র।

এর মূলে স্বদেশের এবং বিদেশের বহু মনোবিজ্ঞানী বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির নানা জটিল দিক তুলে ধরেছেন। আমাদের ভারতীয় পরিবেশে প্রযোজ্য মাত্র কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল। (ক) আজকে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে গেছে। সংসার যন্ত্রকে সচল রাখতে বাবা-মা দুজনকে রোজগারের পথ দেখতে হয়। তাঁদের সন্তানরা তাদের সবচেয়ে প্রিয় বাবা-মার সান্নিধ্য থেকে অনেকখানি বঞ্চিত হয়। ঘরে বন্ধ থাকে, কেউ কেউ বা ঝি চাকরদের কাছে প্রতিপালিত হয়। স্কুলে যেতে পারলে স্কুল তাদের আগলায়। বাবা-মারা তখন যেন আরও নিশ্চিন্ত হন। শিশুমনের কথা খোঁজ করেন না। (খ) একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞান ছোটরা লাভ করতে পারছেনা এবং পরিবেশ সম্বন্ধে শিশুমনের কৌতূহল চরিতার্থ হতে পারছেনা। গৃহশিক্ষকও সে ভার গ্রহণ করতে পারেন না। শিক্ষকের কাজ পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করানো এবং পরীক্ষা পাশের মন্ত্র দেওয়া। (গ) বর্তমানে পরিবার সীমিত। এক সন্তান শিবরাত্রির সলতে। তারজন্য বাবা মার চিন্তার অন্ত থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলের মর্জিকে প্রাধান্য দেন। অন্যায় জেনেও শাসন করেন না। সন্তান জেদী ও বদমেজাজী হয়ে উঠে। তথাপি অভিভাবক না হয়ে বন্ধুই হয়ে উঠেন। (ঘ) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেরও কিছু কিছু পিতা মাতা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। নিজেদের ভোগসুখের জন্য যত চিন্তাভাবনা। সন্তানের দিকে তাকাতে তাঁদের সময় হয় না। (ঙ) অনেকের মধ্যে ঠুনকো মর্যাদাবোধও বড় প্রবল। সন্তানকে ভাল ইস্কুলে না পড়ালে, সন্তান বিদ্যালয়ে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় না হলে, পাঁচটা গৃহশিক্ষক নিয়োগ না করলে, সমাজে মুখ দেখাতে পারেন না। (চ) অনেক পিতামাতা নিজেদের অতৃপ্ত বাসনাকে সন্তানের মাধ্যমে পুষিয়ে নিতে চান। (ছ) সন্তানের বহন ক্ষমতার কথা বিবেচনা না করে অনেকেই লেখাপড়ার সঙ্গে নাচ-গান, ছবি-আঁকা, ইত্যাদি চাপিয়ে দেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার জন্য সন্তানের উপর বইয়ের পাহাড় চাপিয়ে দেন। (জ) আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর স্বাধীনতা লাভ করলাম, তবু আমাদের পরাধীন রক্ত শোষিত হল না। এখনও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মোহ। মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষাই অনেক শিশুর শিক্ষার বাহন। জানিনা, সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের এটি দুরভিসন্ধি কিনা ! (ঝ) আজকের দিনের কিছু কিছু শিক্ষকও বড় কম অপরাধী নন। শ্রেণীকক্ষে ভালছেলের সুনাম এবং যারা পড়াশোনা ততটা ভাল পারেনা তাদের বিদ্রূপ করেন। কেউ কেউ বা ভাল ছেলের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, অপরাপর ছেলের দিকে লক্ষ্যই করেন না। ভালোরা অহঙ্কারী হয়ে উঠে আর তথাকথিত মন্দদের হীনমন্যতা জাগে। কোন কোন শিক্ষক আবার নিজের ও নিজের পরিবারের পঞ্চমুখে গুণগান করেন এবং ফাঁকে-ফাঁকে ছেলেদের দেখিয়ে দেখিয়ে কটূক্তি করেন। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কিশোররা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যতদিন শিক্ষা ও চাকরির সঙ্গে একটা সমতা ছিল ততদিন কিন্তু কোন অসুবিধা ছিলনা। চোখের সামনে তারা দেখছে অজস্র বেকারকে টো টো করে ঘুরে বেড়াতে। সেই সম্বন্ধে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সন্দিহান হয়ে উঠছে। চাকরীর প্রতি মোহ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এবং শিক্ষক মহাশয়রা আজও দূর করতে পারলেন না।

সিগমণ্ড ফ্রয়েডের মতবাদ ঃ

সিগমণ্ড ফ্রয়েডের (বিতর্কিত অস্ট্রিয়ান মনোবিজ্ঞানী) ধারণা হয়েছিল শিশু মনেও যৌন বোধ এবং মাতাপিতা সম্পর্কে যৌন আকর্ষণ বর্তমান। ফ্রয়েড মনের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। সজ্ঞান, অন্তর্জ্ঞান এবং নির্জ্ঞান। শিশুও কৈশোর মনের যৌন কামনা বাস্তবে অসম্ভব বলে অবদমিত হয় এবং সজ্ঞান মন থেকে নির্জ্ঞান মনে জমা হয়। ফ্রয়েডের মতে মনোবিকার প্রধানতঃ অবদমিত এবং অপরিতৃপ্ত যৌন কামনা থেকে জন্ম নেয়।

সেদিন ফ্রয়েডের এই তত্ত্বকে নিয়ে বিতর্কের তুমুল ঝড় উঠেছিল এবং বহু সমালোচনারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল

তাঁকে। পরে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং কিশোরদের মানসিক রোগের একটি কারণ বলেও গণ্য করা হয়েছে।

আজকের আমাদের পরিবেশে কিশোরদের অবচেতন মনকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে এবং যৌন চেতনাকে সজ্ঞানমনে ফিরিয়ে আনার হরেকরকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধান মাধ্যমগুলো যথাক্রমে ঃ—

(১) **টিভি ঃ** যৌন উদ্দীপক চিত্রের একেবারে ছড়াছড়ি টিভিতে। উৎকট পোষাক, বিশেষ করে মেয়েদের অর্ধনগ্ন দেহ, উৎকট অঙ্গভঙ্গি কিশোরদের মনে কী রেখাপাত করে না ? যদি না করে তাহলে সুযোগ পেলে টিভির পর্দার সামনে জোঁকের মত বসে থাকে কেন ? এমন অনেক উৎকট বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় যা শুধু কিশোর কেন বয়স্কদেরও মাথা ঘুরিয়ে দেয়।

(২) **সিনেমা ঃ** পথে ঘাটে, দেওয়ালে যেখানে সেখানে সিনেমার পোস্টার হামেশাই চোখে পড়ে। পোস্টারের প্রধান আকর্ষণ সেই অর্ধনগ্ন নারীদেহ তৎসহ খুনখারাপির রাজা এক নরপিশাচের মূর্তি। সিনেমা দেখার জন্য তরুণদের আকর্ষণও বাড়ছে – ঐ একটি কারণে। অবাস্তব প্রেমকাহিনী, নায়ক নায়িকার কুৎসিত দেহভঙ্গি, যৌন উদ্দীপক গান এবং নাচের নামে স্ত্রী অঙ্গের প্রদর্শনী টিভিতেও প্রদর্শিত হয়। অপরদিকে সমাজের অন্দর মহলের কুকীর্তিগুলোকে ফলাও করে প্রচার করা হয়।

(৩) **সামাজিক পরিবেশ ঃ** সামাজিক পরিবেশও আজ কলুষিত। বিজ্ঞাপনের মডেল, সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের পোষাককে আজ সবাই অনুকরণে ব্যস্ত।

(৪) **বিদ্যালয় ঃ** অধিকাংশ স্কুলে এবং কলেজে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা। অথচ উপযুক্ত যৌন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এখনও করা হয়নি। সহপাঠী ও সহপাঠিনীদের মধ্যে কে কখন একবার তাকিয়েছে কী শিক্ষক মশাই কটূক্তি শুরু করে দিয়েছেন কিম্বা কৌতূহল দমনের কোন সুচিন্তিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। অশালীন মন্তব্যের পরিবর্তে যদি মাঝে মাঝে শারীরবিদ্যার চার্টগুলো বিশ্লেষণ করতেন, যদি বুঝিয়ে বলতেন কঙ্কালতন্ত্র পেশীতন্ত্র প্রভৃতি নারী পুরুষ উভয়ের সমান এবং হরমোনের ক্রিয়ায় ছেলেদের গোঁফ দাড়ি মেয়েদের বুকের মাংসপেশী – যা নারী পুরুষ উভয়ের দেহে বিদ্যমান, তাহলে অনেকখানি উপকৃত হতো তরুণরা। প্রাকৃতিক নিয়মের কথা জেনে মনের কৌতূহলটা দূর করতে পারতো।

উপরোক্ত তিনটি মতবাদ ছাড়াও বর্তমানে আর এক উপসর্গ পরিবেশ দূষণ। প্রথম ও প্রধান উপসর্গ শব্দদূষণ। এমনিতে চারদিকে প্রচন্ড কোলাহল, কলকারখানা ও ইঞ্জিনের কানফাটা শব্দ, তার উপর বর্তমানে আমরা ভারি উৎসব প্রিয় হয়ে উঠেছি। উৎসব মানেই বোম-পটকার তীব্র শব্দ, তীব্র আলোর ঝলকানি, মাইকের গগণবিদারী চিৎকার, বক্সের হৃদযন্ত্র রুদ্ধকারী গুম গুম শব্দ। উচ্চ শব্দ মাত্রেই মস্তিষ্কে আঘাত হানে এবং তীব্র আলো চোখ এবং মস্তিষ্ক উভয়কে ক্ষত বিক্ষত করে। সমীক্ষকরা উল্লেখ করেছেন, উচ্চশব্দ মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের মস্তিষ্কেও আঘাত করে এবং মস্তিষ্ককে সুগঠিত হতে দেয় না। আজকে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, সে মাতৃগর্ভ থেকেই নিয়ে আসছে অপরিণত মস্তিষ্ক — যা শত চিকিৎসায়ও সারবার নয়। প্রকারান্তরে বলা যায়, আজকের মায়েরা জন্মদান করছেন মানসিক রোগাক্রান্ত শিশুদের।

দ্বিতীয়ত কীটনাশকের কথাও ধরা যেতে পারে। ফসল, ফল, শাকসব্জী ইত্যাদির মাধ্যমে রাসায়নিক বিষের অবশেষ আমাদের শীররে জমা হচ্ছে। পরবর্তী বংশধারার মধ্যে মিউটেশন আনাচ্ছে। মিউটেশন ঘটা মানেই কিছু কিছু বিরুদ্ধগুণের প্রকাশ-মানবিক গুণাবলীর বিপরীতগুণ, মানসিক রোগের নামান্তর।

তৃতীয়ত মাদকাসক্তির কথাও ধরা যেতে পারে। মাদকবিরোধী প্রচার যতই হচ্ছে ততই যেন মাদক গ্রহণের প্রবণতা বেড়ে চলেছে। অভিজাতদের মধ্যে মদ খাওয়াটা আবার আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাদক গ্রহণের ফলে স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হয়। মাদকাসক্তদের মস্তিষ্কের ত্রুটিও ধরা পড়েছে। একটা ভয়ঙ্কর তথ্যও উপস্থাপিত করেছেন মনোবিজ্ঞানীরা। বিশেষ স্ক্যানিং পদ্ধতিতে মাদকাসক্ত ও মাদকসক্তব্যক্তির সন্তানসন্ততির মস্তিষ্কের ছবি গ্রহণ করে জানিয়েছেন, মাদকগ্রহণকারীর মস্তিষ্কের যে অসঙ্গতি সেই একই অসঙ্গতি তার ছেলেমেয়ের মস্তিষ্কেরও। অথচ ছেলেমেয়েরা কেউ এখনও মাদক গ্রহণ করেনি।

পেট (PET) পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের অসঙ্গতি নির্ণয় ঃ

যে কোন মানসিক রোগের মূল উৎস যে মস্তিষ্ক – এই সত্য বহু পূর্ব থেকে জানা ছিল। কিন্তু উন্নত যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত না হওয়ায় মস্তিষ্কের কোথায় কী ধরনের অসঙ্গতি আসে তা ধরা যেতো না এবং চিকিৎসারও কোন সুব্যবস্থা ছিল না। বর্তমানে বহু প্রযুক্তি এসেছে। তাদের মধ্যে স্ক্যানিং পদ্ধতি অন্যতম। মস্তিষ্ক সম্বন্ধে তথ্য আহরণের জন্য যে স্ক্যানিং পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে সেই পদ্ধতিটির নাম "পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফী"। সংক্ষেপে "পেট (PET)।

পদ্ধতিটির আবিষ্কর্তা কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিজ্ঞানী "এডওয়ার্ড হফম্যান" এবং "মাইকেল ফেলপস"। আবিষ্কৃত হয়েছে 1975 খৃস্টাব্দে। পদ্ধতিটি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে মস্তিষ্কের অসঙ্গতি ধরার যেমন সুবিধে হয়েছে, তেমনই মানসিক রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও যুগান্তর এসেছে।

পদ্ধতিটির জন্য ব্যবহার করা হয় কোন না কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। সচরাচর C_{11}, O_{15} অথবা N_{13} কে ব্যবহার করা হয়। এদের কোন একটিকে গ্লুকোজের সঙ্গে রাসায়নিক উপায়ে সংযোজিত করিয়ে ইনজেক্শনের মাধ্যমে শরীরে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। তেজস্ক্রিয় অণু পজিট্রন বিকিরণ করে এবং এই বিকিরণ হয় ক্ষণস্থায়ী। বিকিরণের মাত্রার পরিবর্তন ধরা পড়ে মস্তিষ্কের স্ক্যানিং যন্ত্রের সাহায্যে রঙীন ফটোগ্রাফিতে। চিত্র থেকে মস্তিষ্কে গ্লুকোজ বিজারণের মাত্রাটা পুরোপুরি ধরা পড়ে। বর্তমানে আবার ফ্লুরো ডিঅক্সিন গ্লুকোজ ব্যবহার করে ভাল ফল পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

পেট পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের সবকিছুই ধরা পড়ে। মস্তিষ্কের কোন অঞ্চলে কী পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, স্মৃতিকেন্দ্র কীভাবে কাজ করছে, টিউমার ইত্যাদি হয়েছে কিনা, কোন

বিশেষ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা, ইত্যাদি সমূহ তথ্য সরবরাহ করতে পারে। আরও একটা বড় সত্য উদঘাটিত হয়েছে। তথ্যটি আমাদের স্মৃতির রহস্য। দেখা গেছে, আমরা নতুন কোন কিছুকে যখন শিখতে যাই এবং মনে ধরে রাখতে চেষ্টা করি, তখন কোন একটা বিশেষ অঞ্চলের পরিবর্তে কয়েকটা অঞ্চল সক্রিয় হয়ে উঠে। এদের সবার সম্মিলিত যোগাযোগ এবং সক্রিয়তাই আমাদের স্মৃতি।

স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীদের পেট পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের ত্রিমাত্রিক ছবি গ্রহণ করে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন গঠনগত ত্রুটি যথেষ্ট। ত্রুটির জন্য বিশেষ বিশেষ অঞ্চলগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেনা বা সহযোগিতাও করেনা। সবচেয়ে বড় ত্রুটি দেখা গেছে গুরুমস্তিষ্কের অগ্রভাগে। স্বাভাবিক গুরু মস্তিষ্কের অগ্রভাগ অপেক্ষা স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তদের গুরু মস্তিষ্কের অগ্রভাগ বেশ সংকীর্ণ। সংকীর্ণ হওয়ার জন্যই রক্ত পরিবহণ ক্ষমতা কম এবং গ্লুকোজের বিপাকের হারও কম। তবে বিজ্ঞানীরা এইখানে একটু বেকায়াদায় পড়েছেন। মাতৃগর্ভ থেকে এই ত্রুটি আসে কিংবা স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে আসে। কোনটি ? অনেকে দুটি কারণের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

যেসব ছেলেমেয়ের মধ্যে অস্বাভাবিক চঞ্চলতা দেখা যায়, তাদেরও মস্তিষ্ককে পরীক্ষা করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা এদেরও মানসিক রোগীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নাম দিয়েছেন "হাইপার অ্যাকটিভ চাইল্ড।" এদের মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা কম। দেখা গেছে, ওদের মস্তিষ্কের কোন কোন জায়গায় গ্লুকোজের বিপাকহার স্বাভাবিক মস্তিষ্কের তুলনায় অনেক কম। তেমনই শুচিবায়ুগ্রস্তদের মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিপাকের হার অনেকগুণ বেশি।

যাঁরা আবেগপ্রবণ তাঁরাও মানসিক রোগী। আবেগ প্রবণতা কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল এবং প্রয়োজনও। ভাল হওয়ার আবেগ যদি না থাকে, পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার প্রবণতা যদি না থাকে, তাহলে সে উন্নতি করতে পারেনা। যে কোন সৃজনশীল কর্মে চিন্তা ভাবনা ও আবেগ প্রবণতার দরকার হয়। কিন্তু জঘন্য কর্মে লিপ্ত হওয়ার যে আবেগ, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, এগুলোই মানসিক রোগের পর্যায়ে পড়ে। সুস্থ চিন্তা শক্তির অভাবহেতু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হওয়া, হাতাহাতি, মারামারি, খুন জখম ইত্যাদি যারা করে এবং যারা প্ররোচনা দেয় তাদের সবাই মানসিক রোগাক্রান্ত।

শ্রেণী বিভাগ ও চিকিৎসা ঃ

মনঃরোগী স্কিজোফ্রেনিয়াদের কয়েকটা বিভাগে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীরা। এখানে প্রধান পাঁচটি বিভাগের কথা উল্লেখ করা গেল। (১) সরল বা সাধারণ, (২) ক্যাটাবেটিক, (৩) প্যারানয়েড, (৪) সিজো অ্যাফেক্টিভ এবং (৫) হেবিফ্রেনিক।

সরল বা সাধারণ মনঃরোগ আক্রান্তরা মনমরা হয়ে উঠে। কোন বিষয়ে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করে না। নীরবতাকে ওরা ভারি পছন্দ করে এবং তরুণদের মধ্যেই এই রোগটি বেশি দেখা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় বাবা মা একটু সচেষ্ট হলেই সেরে যেতে পারে। ভালভাবে সঙ্গদান করলে, সবকাজে উৎসাহিত করলে এবং তার বিচ্ছিন্ন মনের কারণ খুঁজে বার করতে পারলে ভাল হয়। অবশ্য অন্য বয়সেও এতে আক্রান্ত হয়।

ক্যাটাবেটিকরা পাগলের পর্যায়ে পড়ে। কথাবার্তা এবং আচরণ দুইই অসংলগ্ন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অথবা বসে বসে দীর্ঘসময় অতিবাহিত করতে পারে। হাঁটতে গেলে থমকে দাঁড়ায় কিংবা পেছিয়ে আসে, বিড় বিড় করে বকে, ইত্যাদি। এদের ক্ষেত্রে জিনগত সমস্যা বলে অনেকে মনে করেন এবং পুরুষানুক্রমে প্রকাশ পায়।

প্যারানয়েড শ্রেণীর মনঃরোগীরা নিজেদের প্রচণ্ড জ্ঞানী বলে মনে করে। ওদের ধারণা, তারা যা বলে তা যথার্থ এবং যা করে তাও যথার্থ। আরও মনে করে, তার যথার্থ কথার জন্য প্রতিপক্ষ তাকে হিংসে করে এবং শাস্তিদানের চক্রান্ত করে।

আরও কিছু কিছু লোককে দেখা যায়, যারা অল্প জেনে তর্কে অবতীর্ণ হয় এবং কিছুতেই হারতে চায় না। তর্কের খাতিরে অনেক অসার যুক্তিও প্রদর্শন করে। এদেরও এই পর্যায়ে ফেলা যায় এবং এই প্রবণতা মাদকাসক্তদের মধ্যেই বেশি।

হেবিফ্রেনিক শ্রেণীর রোগের উৎস যৌনজীবনের হতাশা থেকে বলে অনেকে মনে করে থাকেন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এটি মারাত্মক রোগ। এরা প্রচণ্ডভাবে দিবা স্বপ্ন দেখে, অকারণে হাসে অথবা কাঁদে, নানা ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে উঠে এবং প্রচণ্ড ভীতুও হয়।

যাই হোক, বর্তমানে কোন মানসিক রোগ দুরারোগ্য নয় বলে জানিয়েছেন মনোবিজ্ঞানীরা। মস্তিষ্ককে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা করে তাঁরা অসঙ্গতি যেমন ধরতে পারছেন, তেমনই বহু পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছেন। যদিও চিকিৎসা ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘকাল ধরে চিকিৎসা চালাতে হয়। ড্রাগ থেরাপি, বৈদ্যুতিক থেরাপি, মনঃসার্জারী ইত্যাদি বহু ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, কম বয়সে যদি রোগটি আক্রমণ করে এবং রোগীর স্বাস্থ্য যদি ভাল হয় তাহলে অল্পায়াসে সারিয়ে তোলা যায়। মাদকাসক্তদেরও সারিয়ে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে বিলম্বে চিকিৎসা করালে সাময়িকভাবে কিছু ভাল ফল পেলেও পুনরায় প্রকাশ পেতে পারে।

তরুণরা যাতে মানসিক রোগে আক্রান্ত না হয় তারজন্য পিতামাতাকেই সচেষ্ট থাকতে হয়। সর্বাগ্রে দৃষ্টি রাখতে হয় তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি। তারপর পরিবেশ। কিশোরদের সঙ্গদান করলে, এবং তাকে স্বতঃস্ফূর্ত জীবনে উৎসাহিত করলে, উপযুক্ত যৌনশিক্ষা তথা সাধারণ শারীরবিদ্যা হরমোন প্রভৃতির ভূমিকার কথা বুঝিয়ে দিলে এবং আত্মবিশ্বাসী করতে পারলে মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণ নেই। বিজ্ঞানীরা আরও মনে করেন, পিতামাতার ব্যবহার আচরণ অতিরিক্ত আশা ও আকাঙ্খা (এক্ষেত্রে পিতামাতাই মানসিক রোগে আক্রান্ত ধরতে হবে) সন্তানকে মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে সাহায্য করে। কারও মধ্যে আক্রমণের লক্ষণ দেখা গেলে পরিবেশকে পরিকল্পনা মাফিক বদলে দিতে পারলে কাজ হয় বলে জানিয়েছেন মনোবিজ্ঞানীরা।

অধ্যাপক জে. বি. এস হলডেনের রচনা
জল ও লবণের বিষক্রিয়া

অনুবাদ — গোপাল ভট্টাচার্য*

আমাদের শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে বলা যেতে পারে অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে একই রকম রাখার সফল প্রয়াস। মস্তিষ্কে অবস্থিত শ্বসন কেন্দ্রগুলির নির্দেশে আমাদের ফুসফুস দ্রবীভূত গ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করে, বৃক্ক দুটি নিয়ন্ত্রণ করে জল ও লবণকে, অনাল গ্রন্থির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয় কোষের জারণ ও বৃদ্ধি। মস্তিষ্ক ও পেশীর একটি বড়ো কাজ হল পৌস্টিক নালীকে এমনভাবে সাহায্য করা যাতে শর্করা ও অন্যান্য খাদ্যবস্তুর মান স্বাভাবিক থাকে।

স্পঞ্জ কিংবা সাগর কুসুম জাতীয় প্রাণীর কোষকে বিভিন্ন উপাদানের তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের সংস্পর্শে আসতে হয়। তার কারণ হল পরিবেশ থেকে জল ও লবণ তাদের শরীরে সর্বত্র ঢুকে পড়ে। মানুষের দেহে কোষগুলি প্লাজমা বা রক্তের তরল অংশে ডুবে থাকে। তাদের গঠন প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। সরল প্রাণীর কোষের তুলনায় স্তন্যপায়ী প্রাণীর কোষগুলি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া কলাপের ব্যাপারে অনেক বেশি কুশলী। শুধু তাই নয় পরিবেশের পরিবর্তনে সেগুলি অনেক বেশি সংবেদনশীল। স্তন্যপায়ীর কোষকে তুলনা করা যায় সভ্য মানুষের সঙ্গে। ঠিক মতো আহার, বাসস্থান ও পোশাক পেলে সভ্য মানুষ আদিম মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষতার পরিচয় দেয়, কিন্তু তারা কিছুটা কৃত্রিম, ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ অবস্থার মধ্যেই কাজ করতে পারে।

আমাদের শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে বলা যেতে পারে অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে একই রকম রাখার সফল প্রয়াস। মস্তিষ্কে অবস্থিত শ্বসন কেন্দ্রগুলির নির্দেশে আমাদের ফুসফুস দ্রবীভূত গ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করে, বৃক্ক দুটি নিয়ন্ত্রণ করে জল ও লবণকে, অনাল গ্রন্থির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয় কোষের জারণ ও বৃদ্ধি। মস্তিষ্ক ও পেশীর একটি বড়ো কাজ হল পৌস্টিক নালীকে এমনভাবে সাহায্য করা যাতে শর্করা ও অন্যান্য খাদ্যবস্তুর মান স্বাভাবিক থাকে।

অভ্যন্তরীণ পরিবেশে খাদ্য বা অক্সিজেনের ঘাটতি হলে দেহের ওপর কি ধরনের প্রভাব দেয় সেটা আমাদের জানা আছে। তার ফলাফল মারাত্মক হয়। এগুলির আধিক্য জনিত সমস্যা কম। তবে তা দেখা দিলে (যেমন বহুমূত্র ও অক্সিজেনের বিষক্রিয়ায়) তার ফলাফলও একই রকম সঙ্কটজনক হবে। অল্প পরিমাণ বিভিন্ন বিদেশী বস্তুর প্রভাব কতটা খারাপ হতে পারে তা আমাদের অপরাধ বিজ্ঞানের ছাত্রদের ভালোভাবেই জানা আছে। তবে অতি সম্প্রতি লবণ ও জলের নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর দেওয়া সুরু হয়েছে। শরীরের মধ্যে এগুলির বিশেষ রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। কোন কারণে স্বাভাবিক অনুপাতেরও বিচ্যুতি ঘটে না।

মানুষের ক্ষেত্রে জলের বিষক্রিয়ার গল্প এই রকম। স্বাভাবিক মানুষ যত তাড়াতাড়ি জল খায় তত তাড়াতাড়ি জল থেকে মুক্ত হতে পারে। বৃক্কের রোগে আক্রান্ত মানুষ কদাচিৎ প্রয়োজনের বেশি জল পান করে। তাকে সে কাজ করতে উৎসাহও দেওয়া হয় না। কিন্তু অন্য কারণেও বৃক্ক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে পারে। একজন মার্কিন চিকিৎসক পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাস ইনজেকসান দিয়ে একজন বহুমূত্র রোগীর মূত্র প্রবাহ অস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রোগীটির দিনে মূত্রের পরিমাণ ছিল প্রায় চার গ্যালনের মতো। কিন্তু রোগীটি যখন স্বাভাবিক মাত্রায় জল খেতে সুরু করল, তখন হঠাৎ তার খিচুনি সুরু হল। তখন তার একটি শিরার মধ্য দিয়ে দশ শতাংশ লবণের দ্রবণ ইঞ্জেকসানের মাধ্যমে দেওয়া হল। রক্তের প্লাজমার লবণের মাত্রা এক শতাংশের কিছু কম থাকে। এই ব্যবস্থায় রক্তে জল ও লবণের মাত্রা স্বাভাবিক হওয়ায় রোগীর খিচুনী বন্ধ হল। প্রাণীদের বেলায় দেখা গেছে জল ও লবণের অনুপাত বেশি হলে খিচুনি ও অবশেষে মৃত্যু হবে। বেশি পরিমাণে স্ট্রিকনিন (Strychonine) প্রয়োগ করলেও এমনটি হয়। সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল সম্ভবতঃ কিছু স্নায়ু কোষ সিক্ত হয়ে ফুলে উঠে, দীর্ঘ সময় ধরে স্নান করলে আমাদের ত্বক যেমন হয়।

অন্য এলাকায় আরেক ধরনের ঘটনা দেখা গেছে। চিরপরিচিত ল্যাঙ্কাশায়ার কয়লা খনিতে মাটির এক মাইল নিচে (সম্ভবতঃ ইংল্যান্ডের সবচেয়ে গরম এলাকা) খনি

* দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজ, কলকাতা-700 084

শ্রমিকরা বুট ও স্নানের পোশাক পরে কাজ করে। দুপুরের খাওয়ার সময় বুট থেকে ঘাম ফেলে দেয়। একজন লোক এক শিফটে কাজের সময় আঠারো পাউন্ড ঘাম ঝরিয়ে ছিল। সম্ভবতঃ এই মাত্রাও ছাড়িয়ে গেছে। এই ঘামের মধ্যে এক আউন্স লবণ ছিল। একজন সাধারণ মানুষ একদিনে যতটা লবণ খায় এটি তার দ্বিগুণ। মাটির ওপরে এসে শ্রমিকরা লবণের অভাব পূরণ করে বেকন, কিবাপ (লবণে জারিত শুটকি হেরিং মাছ) ও লবণযুক্ত বিয়ারের মাধ্যমে। তারা মাটির নিচে যতদিন এক কোয়ার্টের (1.14 লিটার) বেশি জল না খেত ততদিনি তাদের কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু যে লোকের দুগ্যালন ঘাম ঝরেছে সে তৃষ্ণার্ত এবং কয়লার ধূলোয় তার গলা শুকিয়ে যায়। সুতরাং তার জলপানের মাত্রাও সীমা ছাড়ায়। এর ফলে প্রায়ই পাকস্থলীতে খিল ধরে। কখনো কখনো হাত পায়ে বা পিঠেও। তারা রক্তে লবণের গাঢ়ত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে যতটা জলের দরকার হয় তার চেয়ে বেশি জল খেয়েছে। এক্ষেত্রে বৃক্ক থেকে পেশী ও ত্বকে বেপথ রক্তের পরিমাণ এতটা বেশি যে শরীরের পক্ষে তার থেকে অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়া সম্ভব নয়। খনি শ্রমিকদের লবণ জল দেওয়া হত যার গঠন ঘামেরই মতো। অধিকাংশ লোকের কাছেই ছিল এটি অরুচিকর। তারা এই দ্রবণই কয়েক কোয়ার্ট পান করত এবং আরো চাইত। মাটির নিচে এটাই তাদের নিত্যকার পানীয় হয়ে দাঁড়াল। ফলে খিল ধরা বন্ধ হল এবং অবসাদও কমে গেল। যারা ইঞ্জিনের ইন্ধন জোগায় এবং যারা লোহা ও কাচ শিল্পে কাজ করে তাদের খিল ধরার কারণও যে অতিরিক্ত জলপান সেটিও প্রায় নিশ্চিত। একইভাবে এই অবস্থার মোকাবিলা করা সম্ভব।

এক আউন্সের মতো লবণ খেয়ে বমি না করলে ভীষণ তেষ্টা পায়। এই লবণের দ্রবণকে লঘু করে প্লাজমার অবস্থায় নিয়ে এলে আস্তে আস্তে লবণ ও জলের বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অতিরিক্ত ফ্লুয়িডের কিছু অংশ ত্বকের নিচে জমে থাকার জন্য চোখ ও গোড়ালীর অংশ ফুলে যায়। কয়েক ধরনের বৃক্কের রোগে লবণের অপসারণ খুব কঠিন। রোগী রক্তের গঠন ঠিক রাখার জন্য জল খায় আর তার ফলে তার শরীর ফুলে ওঠে। শোথরোগের সৃষ্টি হয়। কদাচিৎ দেখা যায় ফোলাভাবটি কম কিন্তু সংবহনতন্ত্র অতিরিক্ত লবণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উভয় ক্ষেত্রেই রোগীর অনেক উপকার হয় যদি সে লবণ ছাড়া আহার করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একজন শোথ রোগীর ওজন বাইস পাউন্ড কমেছিল লবণ মুক্ত রেখে। এবং হাসপাতালের স্বাভাবিক খাবার খাওয়ার ফলে সে এক পক্ষ কালের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এই রকম নাটকীয় ফলাফল কয়েকজন ফরাসী চিকিৎসক দেখেছেন আর তার ফলে তাঁরা সব রকম বৃক্কের রোগের চিকিৎসা সুরু করলেন লবণ বর্জনের মাধ্যমে, রোগাক্রান্ত বৃক্কের স্বাভাবিক-ভাবে লবণ অপসারণ করার ক্ষমতা থাকুক আর না থাকুক। লবণ অপসারণের ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকলেও কিছু কিছু বিষাক্ত পদার্থ সেই বৃক্কের দ্বারা বর্জিত হতে নাও পারে। অধিকন্তু লবণ জমার জন্যই কেবলমাত্র শোথ হয় না।

রক্তে অন্যান্য লবণের (সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাড়া) ভূমিকা সম্পর্কে আমরা অতটা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারি না। কিন্তু উদাহরণ হিসেবে বলা যায় শিশুদের এক ধরনের খিঁচুনি দেখা যায় ক্যালসিয়াম লবণের অভাবে এবং এই লবণ বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করে এই রোগ সারানো হয়। এই ক্ষেত্রে কাজ করার সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা হল যে প্রযুক্তি বা প্রয়োগের দরকার তা একেবারে নিখুঁত হতে হবে। রক্তে কুড়ি হাজারের এক ভাগ হল ক্যালসিয়াম। একজন যোগ্য প্রাণ-রসায়নবিদ দশ ঘন সেন্টিমিটার রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ নির্ণয় করতে শতকরা এক ভাগের বেশি ভুল করবেন না। কিন্তু এই কাজের জন্য কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে আর যোগ্য প্রাণরাসায়নিকের সংখ্যাও খুব কম।

অধিকন্তু, অসুখের সময় রক্তের স্বাভাবিক উপাদানই পরিবর্তিত পরিমাণে থাকে। তার ফলে কিসের জন্য কি হচ্ছে তা নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। আধুনিক চিকিৎসার ব্যাপারে একটি আশাপ্রদ পথ হল জীবদেহে সামান্য কিন্তু নির্দিষ্ট রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটানো এবং তার প্রতিক্রিয়া সাবধানে নথিভুক্ত করা। রোমান বিচার ব্যবস্থায় Responsa Prudentiam-এর দ্বারা যে নিয়ম হয়েছিল এই জাতীয় পরীক্ষা সেই ধরনের চিকিৎসা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের মতো। এইভাবে রোগের সেই সব লক্ষ্মণকে বাদ দেওয়া যায় যা রোগীর সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। পরীক্ষক প্যাথলজিস্ট অন্যান্য জীবজন্তুকে নিয়ে পরীক্ষার সময় কম অবাঞ্ছিত লক্ষ্মণগুলি প্রায়ই এড়িয়ে যান এবং অবশেষে নিজের শরীরকে ব্যবহার করেন গবেষণার যন্ত্র হিসেবে। এবং একজন যথার্থভাবে পুরস্কৃত হন তখনই যখন নিজের রাসায়নিক গঠনে সাধারণ অদলবদলের ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও টিটেনাসের (পিঠের ব্যথা থেকে রাত্রির দুঃস্পপ্ন) বিশেষ রকম মুখ ও হাতের বিকৃতি জনিত লক্ষ্মণ ফুটে ওঠে।

শরীরে অতিরিক্ত কিংবা ত্রুটিযুক্ত লবণের উপাদানের জন্য রোগের উপসর্গের সামান্য কিছু দেখা যায় – এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এদিক দিয়ে ক্যানসারের কারণ ব্যাখ্যা বা তা সারানোর চেষ্টা করার প্রয়াস যদিও প্রায়ই করা হয় তা আদৌ ফলপ্রসু হবে বলে মনে হয় না। হরমোন ও প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী পদার্থ সমূহের রাসায়নিক সংজ্ঞা এখনও নির্ধারিত হয়নি। তাদের সঠিকভাবে পরিমাপ করাও যায় না। এদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টার চেয়ে পরিমাণ মনস্ক প্রাণরসায়নবিদ আগ্রহান্বিত হবেন সেই সব পদার্থে যাদের গঠন জানা আছে এবং যাদের গাঢ়ত্ব মাপা যায়। সাধারণ লবণের মতো এত সহজ পদার্থের জ্ঞান থেকে আবিষ্কৃত পদ্ধতি এবং তার ব্যাখ্যা সংক্রান্ত নীতিগুলি ভবিষ্যতের প্রাণরাসায়নিকদের ভালোভাবে পথ প্রদর্শন করতে পারে, যাতে করে এখনও অজানা পদার্থগুলির *শারীরবৃত্তীয় ও রোগসৃষ্টি সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ* নিয়ে তাঁরা গবেষণা করতে পারেন।

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা

চন্দন তিলক ভূঞ্যা*

আজকে সবচেয়ে বড় যোগাযোগ ব্যবস্থা যা অনেক কিছুরই পরিবর্তন সাধিত করতে পারে এবং যা নিয়ে বিশ্বে বড় বড় প্রোজেক্ট রূপায়িত হচ্ছে এবং গবেষণা চলছে তা হোল — আই এস ডি এন (Integrated Services Digital Network)। আই এস ডি এনের মাধ্যমে একটি গ্রাহককে একের বেশি ব্যবস্থায় যোগাযোগ করতে সাহায্য করা হবে।

"যে শিশু ভূমিষ্ঠ হোল আজ - - - - - ব্যক্ত করে অধিকার সুতীব্র চিৎকারে।" ভূমিষ্ঠ লগ্নে শিশুর কান্নার ধ্বনির একটি ব্যাখ্যা চিকিৎসাবিদ্যায় রয়েছে। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, সেরূপ একটি কোন ব্যবস্থা চলে যাওয়ার মুহূর্তেও মানুষের জন্যে নেই কেন আগমনের এই যে শুভ যোগাযোগ ব্যবস্থা তা প্রাকৃতিক নিয়ম। আসা-যাওয়ার এই প্রাকৃতিক নিয়মকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন "আরম্ভ আমাদের আয়ত্তে, শেষ আমাদের আয়ত্তে নহে।" যাই হোক, মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী। সে তার জীবন পৃথিবীতে শুরু করে একটি যোগাযোগের মধ্য দিয়ে। আবার বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাই মানুষকে দিন দিন উন্নততর করে তুলেছে।

আমাদের কথোপকথনের মাধ্যমে যে প্রাকৃতিক যোগাযোগের ব্যবস্থা, তার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে, সামান্য খানিকটা জায়গার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ। একটি ঘরের মধ্যে কিংবা বড় জোর একটা বাড়ীর মধ্যে আমরা মুখের ভাষা দিয়ে যোগাযোগ করতে পারি। কিন্তু তার বাইরে ধরা যাক, বিজ্ঞান কলেজের রেডিও ফিজিক্স এবং ইলেকট্রনিক্স বিভাগে দাঁড়িয়ে আমরা কি কথার মাধ্যমে পদার্থবিভাগের কারও সাথে কথা বলতে পারব.? লক্ষ্য করা যেতে পারে, সামান্য দূরত্বের মধ্যেও কথোপকথন, প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। তাই দূর যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রাচীন কাল থেকে ; চিঠি, বই, ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রের ব্যবহার চলে আসছে। চিঠি মূলত ব্যক্তিগত যোগাযোগের বাহন হয়ে থাকে, আর বই পত্র জনসাধারণের অবাধ যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। প্রাচীন কালে এইসব এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে থাকত, পায়রা, রাজ ঘোড়া, রাজদূত ; ক্রমে ক্রমে তা ডাক ব্যবস্থার রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এইসব যোগাযোগ ব্যবস্থায়, যোগাযোগ তাৎক্ষণিক ছিল না। বহু সময় লাগত, এক জাগার সংবাদ বা তথ্য অন্য জায়গায় পরিবেশিত হতে। যেমন যখন বিমানের ব্যবস্থা ছিল না, জল-জাহাজের মাধ্যমের ভারতের কোন সংবাদ, আমেরিকায় পৌছতে হয়ত এক বছর লাগত। অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার গতিবেগ ছিল খুবই সীমিত।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকতার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ যদি দিল্লী থেকে কলিকাতাতে পৌছতে এক সপ্তাহ লাগত, তাহলে এই সংবাদের গুরুত্ব এবং ঐতিহ্য দুটোই নষ্ট হয়ে যেত। বিদেশে পাঠরত বা কর্মরত পুত্রের দৈনন্দিন খবরাখবর পিতার নিশ্চয়ই আগ্রহের বস্তু, এখানেও তাৎক্ষণিক সংবাদ পরিবেশনের সামাজিক দায়বদ্ধতা এসে যায়। গবেষণার ক্ষেত্রে এই তাৎক্ষণিকতার প্রয়োজন খুবই জরুরী। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ কিংবা বসুর সংখ্যায়ন তত্ত্ব যদি বিশ্বের অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কাছে পৌছতে বছর খানেক সময় লাগত, তাহলে বিজ্ঞান গবেষণাও সাথে সাথে বছর বছর পিছিয়ে থাকত। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষার ইত্যাদির প্রসারে, তাৎক্ষণিক দূরযোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এবং সেই কারণেই দ্রুততম এবং বিবিধ ধরনের যোগাযোগের প্রয়োজন। সেই তাগিদেই, ইলেকট্রিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা, অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটেছে। অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগের জন্যে, দূরভাষ ও রেডিও ছেড়ে আমরা তৈরি করেছি ডাটা পাঠানোর জন্যে ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেম যার মধ্যে ফ্যাক্স, ইলেকট্রনিক্স মেল ইত্যাদি রয়েছে ; এবং ছবির জন্যে দূরদর্শন, ভিডিও ফোন ইত্যাদি।

আমরা তাই প্রবন্ধে দেখব, বিশ্বে এই মুহূর্তে কেমন সব অভিনব যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে এবং নূতন নূতন কেমন সব চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা রূপায়নের জন্যে।

* Nirjuli-791109, Aurunachal Pradesh

ইলেকট্রিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

তাৎক্ষণিকতা তথা গতিবেগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই ইলেকট্রিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা হয়। আমরা যখন কথা বলি, তখন আমাদের কথার বাহক বাতাস। ইলেকট্রিক্যাল যোগাযোগের মূল বাহক তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ বা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ। এই তরঙ্গ শূন্যস্থানে, 300000000 মিটার প্রতি সেকেন্ড গতিবেগে প্রবাহিত হয়। ফলে তাৎক্ষণিকতা অনেক অনেকগুণ বেশি হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি রাজঘোড়ার গতিবেগ বড়জোর 30,000 মিটার প্রতি সেকেন্ড। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রায় 10,000 গুণ বেশি বেগে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ ছুটতে পারে, রাজঘোড়ার চেয়ে।

যে কোন ইলেকট্রিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল পরিকাঠামো চিত্র অনুযায়ী হয়ে থাকে। যে সংবাদ বা তথ্যটি প্রেরিত হবে তা প্রেরক যন্ত্রের অন্তঃদ্বারে দেওয়া হয়। ঐ তথ্যকে প্রেরক যন্ত্র সমতুল্য তড়িৎ তরঙ্গে রূপায়িত করে থাকে

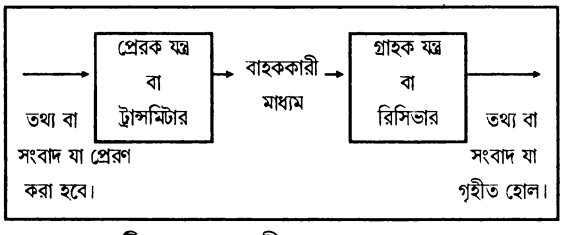

এবং তরঙ্গটিকে বহনকারী মাধ্যমের (transmission line-এর) দ্বারা পাঠানোর উপযুক্ত হিসেবে তৈরি করে। তারপর ঐ তরঙ্গ বহনকারীর মাধ্যমে (যেমন টেলিফোনের ক্ষেত্রে দুটি কপার তারের মধ্য দিয়ে) প্রবাহিত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রে পৌঁছায়। গ্রাহক যন্ত্র, প্রেরক যন্ত্রটির ঠিক বিপরীত কাজটি করে থাকে। অর্থাৎ ইলেকট্রিক তরঙ্গকে সমতুল্য তথ্য বা সংবাদে রূপায়িত করে' তা গ্রাহককে পরিবেশিত করে থাকে।

মর্সের টেলিগ্রাফের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা হয়। 1838 খৃঃ "Attention, the Universe ! By Kingdoms, right wheel !" — কথাটি ইলেকট্রিক্যাল টেলিগ্রাফের মাধ্যমে রেকর্ড করেন স্যামুয়েল মর্স। টেলিগ্রাফ, ডাটা পাঠানোর একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা। এরপর 1876 খৃঃ আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল, দূরভাষ যোগাযোগের ব্যবস্থা আবিষ্কার করেন। ইলেকট্রিক্যাল টেলিফোন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। 1901 খৃঃ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর তত্ত্ব নিয়ে মার্কোনি রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা রূপায়ন করেন। এইভাবে ইলেকট্রিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল।

ইলেকট্রিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থার খোলনালচে পাল্টাতে শুরু করে, 1946 খৃঃ ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটার উদ্ভাবনের ফলে। অন্যদিকে আই সি (Integrated Circuit) প্রযুক্তি তাতে আর একটি পাখা যুক্ত করে। আজকে যে আমরা নানান ধরনের ও উন্নতমানের ইলেকট্রিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করতে পেরেছি তার মূল স্তম্ভ কম্পিউটার এবং আই সি প্রযুক্তি।

যোগাযোগ ব্যবস্থার দৃষ্টি থেকে আমরা মোটামুটি দু'রকম যোগাযোগ দেখতে পাই, — এক, ভয়েস্ কমিউনিকেশন (Voice Communication) যার মূল কেন্দ্রবিন্দু টেলিফোন এবং দুই ডাটা কমিউনিকেশন (Data Communication) যার বর্তমানে মূল স্তম্ভ কম্পিউটার। ভয়েস এবং ডাটার মধ্যে তফাৎ একটি উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক। কোন ছাত্র তার বাবাকে টেলিফোন করে পরীক্ষার ফলাফলের কথা জানাল। এটি ভয়েস কমিউনিকেশন। ঐ ছাত্রটি কিছু পরে মার্কশীট ফ্যাক্স করে পাঠাল তার বাবার কাছে, এটি ডাটা কমিউনিকেশনের উদাহরণ। ভয়েস কমিউনিকেশনে যোগাযোগ তাৎক্ষণিক হওয়া চাইই। ডাটা কমিউনিকেশনে যোগাযোগ তাৎক্ষণিক না হলেও ক্ষতি নেই।

আধুনিক ভয়েস কমিউনিকেশন ঃ

দূরভাষ যোগাযোগ ব্যবস্থা যে কতখানি উন্নতমানের হয়েছে তা আমরা STD/ISD (Subscribers 'Trunk Dialing / International Subscribers' Dialing) ব্যবস্থার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারি। বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে অন্য যে কোন প্রান্তে যে কোন গ্রাহক STD / ISD এর মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করে কথাবার্তা বিনিময় করতে পারেন। উন্নতমানের ইলেকট্রনিক্স সুইচিং এবং কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই STD / ISD সম্পন্ন হয়েছে। এমনকি, আমরা কোন ভুল নম্বর যদি ডায়াল করে থাকি বা যে নম্বর ডায়াল করছি সেই নম্বরের সমস্ত লাইন যদি ব্যস্ত থাকে তাও টেলিফোন কেন্দ্র গ্রাহককে জানিয়ে দেয়। যখন আমরা কথাবার্তা বলি তখন টিক টিক আওয়াজের মাধ্যমে কত টাকা টেলিফোনে বিল হচ্ছে তাও আজকালকার টেলিফোন ব্যবস্থায় জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। টেলিফোন ব্যবস্থার এইসব মূল ব্যবস্থা ছাড়াও, সাহায্যকারী বা সহযোগী ব্যবস্থা হিসেবেও অনেক ব্যাপারই সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, answering machine (উত্তরদাতা)। "উত্তরদাতা" নামক একটি মেশিন এখন বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এই মেশিনটি টেলিফোন সেটে লাগিয়ে নিলে, অনেক সুবিধাই পাওয়া যায়। যেমন আপনি যদি বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে আপনার বাড়ীতে টেলিফোন এলে ঐ উত্তরদাতা মেশিন যিনি টেলিফোন আপনাকে করছেন তার সাথে কথা বলতে পারবেন। এটা উত্তরদাতা মেশিনের রেকর্ডিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব হয়। আবার টেলিফোন যিনি করেছিলেন, তিনি কিছু বলতে চাইলে তাও রেকর্ডিং হয়ে থাকবে। আপনি বাড়ীতে ফিরে এসে, কি সংবাদ আছে তা জেনে নিতে পারবেন। তাছাড়া এই মেশিনে আরও অন্যান্য অনেক ফীচার থাকে। যেমন অসময়ে যাতে আপনাকে

টেলিফোনে কেউ বিরক্ত না করে বিশেষ কোন ব্যক্তি যাতে আপনাকে টেলিফোনে না যোগাযোগ করতে পারে ইত্যাদি ব্যবস্থাও রূপায়ন করা সম্ভব।

সেলুলার (Cellular), মোবাইল (Mobile) টেলিফোন এবং পেজিং (Paging) হচ্ছে আধুনিকতম দূরভাষ ব্যবস্থার বহুমুখীতা। সেলুলার টেলিফোন ব্যবস্থায় একটিমাত্র নম্বরের সাহায্যে বিশ্বব্যাপী আপনার পরিচয় স্থাপনের ব্যবস্থা রূপায়নের চেষ্টা চলছে। অর্থাৎ যদি আপনার কলিকাতায় ও মুম্বাইতে এখন দুটি টেলিফোন থাকে, তাহলে তারজন্যে ভিন্ন দুটি নাম্বার আছে। কিন্তু সেলুলার ব্যবস্থায় UTN (Universal Telephone Number) অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী একটি নাম্বার একটি লোকের জন্যে থাকবে। আপনি যেখানেই থাকুন, আপনার টেলিফোন সেট (wireless) ব্যাবহার করে আপনি অন্য যে কোনও ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা বলতে পারবেন, তেমনি আপনার সাথেও অন্য যে কেউ কাথাবার্তা বলতে পারবেন।

মোবাইল টেলিফোন ব্যবস্থায়, আপনার টেলিফোন সেট wireless হবে, কিন্তু আপনি শুধুমাত্র যে exchange এর অন্তর্গত তারই ভিতর এর ব্যবহার করতে পারবেন।

ধরুন একজন ডাক্তার পাঁচটি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে গেলে, আপনাকে পাঁচটি হাসপাতালে যোগাযোগ করে দেখতে হবে কোথায় পাওয়া যায়। এমনও হতে পারে, তাঁকে খুঁজে পেলেও অপারেশন-এর কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁকে তক্ষুনি পাওয়া যাবে না। অথচ আপনার এমনই জরুরী প্রয়োজন যে তিনি ফ্রি হওয়ার সাথে সাথেই আপনার সাথে কথা বললে ভালো হয়। এরকম অবস্থায়পেজিং (Paging) অপরিহার্য। ডাক্তারবাবুর সাথে বা পকেটে একটি পেজিং মেশিন থাকলে, যে কোনও অবস্থায় তাঁর পেজিং মেশিনে একটি ম্যাসেজ রাখা যায়। টিং টিং বা ক্রিং ক্রিং শব্দে ম্যাসেজ এলে, ডাক্তারবাবুকে পেজিং মেশিন জানিয়ে দেবে। ব্যস্ততা শেষ হলে, পেজিং এর বক্তব্য অনুযায়ী ডাক্তারবাবু আপনার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। মনে রাখা উচিত যে পেজিং একটি একমুখী ব্যবস্থা।

খুবই সুখের কথা, আমাদের দেশে এবং কলিকাতাতেও এইসব আধুনিক ব্যবস্থা রূপায়িত হওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে।

ডাটা কমিউনিকেশন ঃ

বিশ্বব্যাপী ডাটা কমিউনিকেশন যে কী ব্যাপক ও বহুমুখী আকার ধারণ করেছে এবং তা যে কী ভয়ানক মানব কল্যাণে ব্রতী তা হাতের কাছের কয়েকটি উদাহরণেই বোঝা যায়। কলিকাতাতে বসেই বিশ্বব্যাপী যে কোন এয়ার লাইনসের টিকিট বুকিং করা সম্ভব। আজকের ট্রেন রিজার্ভেশনের যে সহজতম উপায় আমরা দেখি তাও এই ডাটা কমিউনিকেশনের দয়ায়। ফ্যাক্স (FAX – Fly Away Xerox), ই-মেল (Electronic Mail) ইত্যাদিও ডাটা কমিউনিকেশনের উদাহরণ।

আজকে সবচেয়ে বড় যোগাযোগ ব্যবস্থা যা অনেক কিছুরই পরিবর্ত সাধিত করতে পারে এবং যা নিয়ে বিশ্বে বড় বড় প্রোজেক্ট রূপায়িত হচ্ছে এবং গবেষণা চলছে তা হোল – আই এস ডি এন (Integrated Services Digital Network)। আই এস ডি এনের মাধ্যমে একটি গ্রাহককে একের বেশি ব্যবস্থায় যোগাযোগ করতে সাহায্য করা হবে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

ধরুন পুলিশ স্টেশনে একটি টেলিফোন এল যে কোন জায়গায় রাজনৈতিক দাঙ্গামা হচ্ছে, সেই জায়গাটিতে তাড়াতাড়ি পৌছানোর অনেক রাস্তা আছে। জায়গাটি যদি কলিকাতার মধ্যে হয় তাহলে জ্যামের সম্ভাবনা আছে। এখন যদি এমন ব্যবস্থা থাকত যে, যখন টেলিফোন এল সাথে সাথে যে জায়গার কথা বলা হচ্ছে সেখানে পৌছাবার সবকটি রাস্তার তখনকার অবস্থা বা চিত্র কম্পিউটারে ফুটে উঠত, তাহলে সেই অবস্থা অনুযায়ী পুলিশ সঠিক রাস্তাটি বেছে নিত। অর্থাৎ দুটি ইন্টিগ্রেটেড যোগাযোগ — একটি ভয়েস ও অপরটি ডাটা, এক্ষেত্রে খুবই জরুরী।

ধরুন, ডাক্তারবাবুকে একটি রোগী টেলিফোনে তার বর্তমান অসুবিধার কথা জানাচ্ছেন। এই অবস্থায় ডাক্তারবাবুর চেম্বারে যদি রোগীর অতীত রেকর্ড (যেমন আগে কি ঔষুধ খেয়েছেন, কি কি অসুবিধা ছিল ইত্যাদি) এর ডাটাগুলি ভেসে ওঠে, তাহলে ডাক্তারবাবুর পক্ষে সহজ হয় রোগীর চিকিৎসা।

এইসব ক্ষেত্রে আই এস ডি এনের প্রয়োগ আছে। সারাবিশ্বব্যাপী আই এস ডি এন তাই এত সমাদর পাচ্ছে।

উপসংহার ঃ

যেমন বহুমুখী ও ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, তেমনি ইলেকট্রিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়িয়ে অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে বেশি করে নজর দেওয়া হচ্ছে। ভয়েস এবং ডাটা কমিউনিকেশনের দুটি ক্ষেত্রেই। বিশেষ করে অনেক বেশি গতিসম্পন্ন ডাটা কমিউনিকেশনের জন্যে সলিটন (Soliton) কমিউনিকেশন নামক একটি বিষয়ের উপর চলছে প্রচুর গবেষণা।

কোথা যে শেষ কে জানে !

আবিষ্কারের কাহিনী

অ নি ল দা স*

আবিষ্কার অতি সাধারণ মনে হলেও, কিছু আবিষ্কার কিন্তু প্রকৃতই বিস্ময়কর। এই আবিষ্কার সকল আমাদের মনে কেবল বিস্ময়ই জাগায়না, মনে হয় যেন গ্রহান্তরের অতি বুদ্ধিমান কোন জীব পৃথিবীর বুকে নেমে এসে এসব আমাদের উপহার দিয়ে গেছে।

আমাদের দৃষ্টির অগোচরে প্রকৃতিতে যে অসংখ্য অজানা উপাদান ছড়িয়ে আছে সেসব উপাদনকে খুঁজে বের করার নামই আবিষ্কার। আবিষ্কার সমৃদ্ধ বিজ্ঞানের ইতিহাস বহু চকমপ্রদ আবিষ্কারের কাহিনীতে ভরা। এসব কাহিনী রূপকথার মত শোনায়, কল্পকাহিনীকেও যেন হার মানায়। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেসব জিনিস ব্যবহার করে থাকি তার প্রায় সবই মানুষের আবিষ্কারের ফসল এবং আজ পর্যন্ত যত আবিষ্কার মানুষ করেছে সবই উৎসর্গিত হয়েছে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, মানব সমাজের হিতের জন্য। এসব আবিষ্কারের মধ্যে বেশকিছু আবিষ্কার অতি সাধারণ মনে হলেও, কিছু আবিষ্কার কিন্তু প্রকৃতই বিস্ময়কর। এই আবিষ্কার সকল আমাদের মনে কেবল বিস্ময়ই জাগায়না, মনে হয় যেন গ্রহান্তরের অতি বুদ্ধিমান কোন জীব পৃথিবীর বুকে নেমে এসে এসব আমাদের উপহার দিয়ে গেছে।

যাই হোক, মানষ যে অসংখ্য আবিষ্কার করেছে তাদের অধিকাংশই কিন্তু সংগঠিত হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে। কিছু একান্তই আকস্মিকভাবে। প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের অদম্য আগ্রহও মানষের মনে আবিষ্কারের নেশা ধরায়। কিছু আবিষ্কার আকস্মিকভাবে হলেও তা মানষের অশেষ কল্যাণসাধন করেছে। এক্সরশ্মি, তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার ঘটেছে একান্তই আকস্মিকভাবে। কিন্তু আমাদের জীবনে এই আবিষ্কার দুটি যেন প্রকৃতির প্রেরিত দূতরূপে আবির্ভূত হয়েছে। এমন অনেক আবিষ্কারের নাম করা যায়। সাম্প্রতিককালে আমেরিকায় জনৈক বাঙ্গালী বিজ্ঞানী মারাত্মক ভাইরাস ঘটিত রোগের ভাইরাস নিধনকারী ঔষধ আবিষ্কার করতে চলেছেন বলে যে দাবী করেছেন তা নাকি সংঘটিত হয়েছে একান্তই আকস্মিকভাবে।

প্রকৃতি আপনখেয়ালে যে অমূল্য সম্পদ লকিয়ে রেখেছিল, মানষ তার বেশকিছু খুঁজে পেয়েছে। এখনও যে কত অমূল্য রত্নরাজি প্রকৃতি সযত্নে আগলে রেখেছে তা আমাদের জানা নেই। বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে আবিষ্কারগুলির সঙ্গে যেমন জড়িত রয়েছে কিছু অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মানষের কথা, তেমনি তথাকথিত বহু সাধারণ মানষের অবদানও কিন্তু কম নেই। এমন বহু সাধারণ মানষের নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। ফলে তাঁরা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। দেখা গেছে যে প্রায় একই সময়ে একই আবিষ্কার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে একের অধিক মানষের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু কৃতিত্বের ভাগীদার হয়েছেন তিনি যিনি তাঁর নাম প্রথম কোন বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন। আরও জানা গেছে যে একই আবিষ্কারের জন্য (যেমন এরোপ্লেনের আবিষ্কার) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বহু মানষ বছরের পর বছর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সফল হয়েছেন আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয়। এঁরাই ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়েছেন। অন্য উৎসর্গীকৃত মানষদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান পেলেও তাঁদের নাম আমরা খুব কমই জানি।

বিন্দু বিন্দু জল যেমন মহাসমুদ্রের সৃষ্টি করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকাকণা মনোমুগ্ধকর ভূখণ্ডের সৃষ্টি করে, তেমনি বহু মানষের নিরলস পরিশ্রম এবং সৃজনী প্রতিভায় গড়ে উঠেছে আবিষ্কারের বিশাল ভাণ্ডার। দৈনন্দিন জীবনে আমরা সুঁচ থেকে টেলিভিশন (ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, কমদামী থেকে বেশি দামী) যেসব জিনিস ব্যবহার করে থাকি এসবের প্রতিটিই মানষ নামক বুদ্ধিমান জীবের আবিষ্কারের ফসল। প্রাণীকুলে কেবল মানষই আবিষ্কার করে, অন্যকোন প্রাণী নয়। এখানেই অন্য প্রাণী থেকে মানুষের অন্যতম তফাৎ। আগেই বলেছি, এমনকিছু আবিষ্কার মানষ করেছে যা পরম বিস্ময়ের। 'টেলিভিশন' এবং 'কম্প্যুটার' তো আধুনিক যুগের পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের দুটি। কৃত্রিম উপগ্রহের আবিষ্কারও কম বিস্ময়ের নয়। এই কৃত্রিম উপগ্রহের দৌলতেই আজ হাজার হাজার মাইল দূরের স্থানগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন ঘটেছে। দৈত্যের মত ক্ষমতাশালী কম্প্যুটারগুলি অবিশ্বাস্য কম সময়ে অতি নিখুঁত ভাবে সব বিশাল বিশাল কাজ করে দিচ্ছে। চাঁদের মাটিতে পদার্পণের পিছনেও কম্প্যুটারের অবদান কম নয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি মানুষের জীবনে যে অভূতপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কেবল স্বাচ্ছন্দ্যই নয়, মানষের জীবন যাত্রার মানেরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু অধিক স্বাচ্ছন্দ্য মানষের আত্মিক উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আত্মিক অবনতির ফলস্বরূপ যেসব অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটছে, তা প্রতিদিনের সংবাদ পত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানষের মধ্যে যে দেবত্ব গুণগুলি গুপ্ত অবস্থায় রয়েছে সেসবের বিকাশসাধন ঘটছে না। যেন তেন প্রকারেণ অর্থ উপার্জন করে বিজ্ঞানের বিনোদনমূলক এবং শ্রমলাঘবকারী আবিষ্কারগুলিকে ক্রয় করে আবাসগৃহ ভর্তি করতে পারলেই আমরা নিজেদের পরম সৌভাগ্যবান মনে করছি। নিজেদের সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ মানষরূপে জাহির করতে সচেষ্ট হচ্ছি। কিন্তু এসব জিনিস কেনবার সময় অথবা দিনের কোনও এক শুভমুহূর্তেও কি আমাদের সেসব মানুষের কথা

* রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, রহড়া, 24-পরগণা (উত্তর)।

মনে পড়ে যাঁরা তাঁদের সারাটাজীবন উৎসর্গ করেছিলেন কেবল আবিষ্কারের নেশায় নয় — অকপটচিত্তে মানব সমাজের হিতের জন্য। আসুন, সেসব প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিভাজ্জ্বোল মানুষদের আবিষ্কারের কাহিনী আমরা জানবো।

চাকার আবিষ্কার ঃ

চাকার আবিষ্কার মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেবল উদ্ভাবনী দক্ষতায় অভূতপূর্ব নয়, সম্ভবতঃ মানষের আবিষ্কারগুলির মধ্যে সর্বোত্তম। চাকার আবিষ্কার না হলে আমাদের একান্ত গর্বের জিনিস 'মানবসভ্যতা' এর কোন অস্তিত্ব থাকত না। কোন এরোপ্লেন উড়তনা, মোটরগাড়ী বা ট্রেন চলত না, ঘড়ি সময় জানাতনা, কলকারখানায় কোন কাজ হতো না। প্রকৃতই, এই চাকার উপর ভর করেই আমাদের জগৎ গড়িয়ে চলেছে।

কিন্তু কোথায়, কখন, কিভাবে এই চাকার আবিষ্কার হয়েছিল তা কিন্তু আমরা আজও জানতে পারিনি। অতীতের গর্ভে সেই পরম শুভমুহূর্তটি হারিয়ে গেছে। আমরা কেবল আজ প্রশংসা করতে পারি সেই অজানা, অজ্ঞ, অমার্জিত, অর্ধ উলঙ্গ পূর্ব পুরুষদের যাঁদের অত্যুৎকৃষ্ট মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপে সম্ভব হয়েছিল এই চাকার আবিষ্কার। মনে করা হয়, আজ থেকে প্রায় পনের হাজার অথবা তারও বেশি বছর আগে 'মেসোলিথিক' যুগে (পুরাতন এবং নতন প্রস্তর যুগের অন্তবর্তী যুগ) চাকার আবিষ্কার হয়েছিল। কিন্তু কিছু প্রত্নতত্ত্ববিদ বিশ্বাস করেন যে আজ থেকে প্রায় বিশ হাজার বছর আগে সুইৎজারল্যান্ড এবং জার্মানীর আল্পস্ পর্বতমালার হ্রদের ধারে বসবাসকারী মানষদের মধ্যে চাকার গাড়ীর ব্যবহারের প্রচলন ছিল। নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে সিরিয়া এবং সুমারিয়াতে খৃষ্ট জন্মের আগে 3000 হাজার থেকে 4000 হাজার বছরের মধ্যে চাকার গাড়ীর ব্যবহার শুরু হয়। মেসোপটেমিয়াতে খৃষ্টজন্মের 3000 বছর এবং সিন্ধুনদের অববাহিকার অধিবাসীদের মধ্যে 2500 হাজার বছর আগে চাকার গাড়ীর ব্যবহার শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়। মিশরের মানুষ স্পোক্ লাগানো চাকার আবিষ্কার করে খৃষ্ট জন্মের প্রায় 1800 বছর আগে। বিশেষভাবে নির্মিত এই চাকাটি, গাছের গুড়ি থেকে চাকতির আকারে কেটে নেওয়া অংশ দিয়ে তৈরি চাকার তুলনায় অনেকবেশি মজবুত ও হালকা ছিল। পরবর্তীকালে মিশরীয়দের দ্বারা এই চাকার প্রভূত উন্নতি হয় এবং গ্রীক-রোমানরা এই চাকার দ্বারা রথ নির্মাণ করে যুদ্ধে এবং ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতায় কাজে লাগায়।

এখন আমরা দেখবো যে কিভাবে এই চাকার আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। অতীতের গর্ভে সেই সময় হারিয়ে গেছে। যেহেতু আবিষ্কারের সেই শুভক্ষণে আমরা কেউ সাক্ষী হয়ে থাকতে পারিনি, সুতরাং আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার কল্পনাশক্তি। কল্পনার ডানায় ভর করে সেই মেসোলিথিক যুগে আমরা ফিরে যাবো। ফিরে গিয়ে দেখবো, দৈনন্দিন জীবনে যে অসংখ্য জিনিস ব্যবহার করে থাকি তার কোনটাই আমাদের জানা নেই। স্বাভাবিক কারণেই আমরা অসহায় বোধ করব। কিভাবে খাদ্য, আশ্রয় এবং পরিধানের ব্যবস্থা হবে আমরা জানিনা। কিন্তু আমাদের হাত, পা রয়েছে। সর্বোপরি রয়েছে একটি মস্তিষ্ক। আমাদের সমস্ত আশা-ভরসার স্থল। এরাই হবে আমাদের সব সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার।

প্রথমেই আমাদের ক্ষিদে পাবে। ক্ষিদের জ্বালায় অতিষ্ট হয়ে বন্যপ্রাণী হত্যার চিন্তা মনে উদয় হবে। ফলে প্রস্তর দিয়ে কিছু অস্ত্র নির্মাণ করে বনের উদ্দেশ্যে রওনা দেব। বন্যপ্রাণী হত্যার পর তাকে নিজেদের বাসস্থান গুহায় নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কোন যান্ত্রিক পরিবর্তনের কথা আমাদের জানা নেই। একমাত্র উপায় বনের মধ্যদিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া। মনে হবে এ এক মস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি যদিও অসম্ভব নয়। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যেই কাউরও হয়ত হঠাৎ মনে হবে যে প্রাণীটিকে কোন বৃক্ষশাখায় রেখে টেনে নিয়ে গেলে কেমন হয় ? অথবা একজোড়া কাষ্ঠ খণ্ডের দ্বারা সরল আকৃতির শ্লেজগাড়ী তৈরি করে তাতে চড়িয়ে নিয়ে গেলেই বা কেমন হয় এতে প্রাণীটিকে গুহায় নিয়ে যাওয়া অনেক বেশি সহজ হবে। যদি এ ধরনের চিন্তা আমাদের মাথায় আসে এবং তা কার্যে রূপান্তরিত করি তবেই আমরা স্থলভূমিতে পরিবহণের উপযোগী প্রথম যান আবিষ্কারে সক্ষম হব।

যে সরল আকৃতির শ্লেজগাড়ীর কথা বলা হলো তা আবিষ্কারের পর আমাদের আদিম পূর্বপুরুষ আর একটি অসাধারণ আবিষ্কার করেন। তাঁরা বেলনাকার বস্তু আবিষ্কার করেন, যার প্রচলিত নাম 'রোলার' (roller)। এই রোলারের আবিষ্কার আকস্মিকভাবে ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। আবিষ্কারের শুভক্ষণ কল্পনায় যেভাবে চিত্রিত করা হয় তা এই যে কোন আদিম মানব জ্বালানীর জন্য অথবা ঘরবাড়ী নির্মাণের জন্য কিছু গাছের গুড়ি কেটে এক জায়গায় রেখিছিলেন। হঠাৎ একটি ভারী পাথর জমির ঢাল বেয়ে গড়িয়ে এসে দুটি গুড়ির উপর আড়াআড়িভাবে পড়ে। পাথরটিকে সরাতে গিয়ে গুড়ি দুটি গড়িয়ে চলে গেল। এই ঘটনা থেকে তিনি আবিষ্কার করেন যে দুটি কাঠের গুড়ির উপর ভারী পাথর চাপিয়ে সহজেই সেটিকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত না পাথরটি গড়িয়ে পড়ে যায়।

পরিবহণের জন্য রোলারকে মানুষ বহুদিন ব্যবহার করে। এখনও পৃথিবীর কোনও কোন জায়গায় এর ব্যবহার রয়েছে। প্রয়োজনানুসারে দুটি, তিনটি অথবা চারটি কাঠের গুড়ির উপর বড় পাথরের খণ্ড চাপিয়ে কিছু মানষ পাথরটিকে ঠেলেন। পাথর কিছুটা এগিয়ে গেলে অন্য কোন মানষ পিছনের কাঠের গুড়িকে তুলে নিয়ে সামনে স্থাপন করেন। এভাবে পাথর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গড়িয়ে চলে। মনে করা হয়, এই রোলার পরিবহণের সাহায্যে অন্য কোথাও থেকে পাথর নিয়ে এসে মিশরের পিরামিড তৈরি করা হয়।

কিন্তু এই রোলার পরিবহণ আদিম মানষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে দেখা দেয়নি। কারণ অনবরত পিছন থেকে কাঠের গুড়ি নিয়ে সামনে স্থাপন করা ক্লান্তিকর এবং বিরক্তিকর হয়ে দেখা দেয়! ফলে, কাজের গতি কমে যায়। প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের আদিম পূর্বপুরুষ রোলার পরিবহণের উন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট হয়। তাঁরা একটি গাড়ী তৈরি করেন। গাড়ীটিতে একটি পাটাতন ছিল যার উপর ভারী বস্তু রাখা যেত। পাটাতনের নীচে চারটি উলম্ব গোঁজের সাহায্যে কেবল একটিই রোলার আটকানো থাকত। কিন্তু এই যানের একটি অসুবিধা ছিল এই যে রোলার এবং পাটাতনের মধ্যে ঘর্ষণের পরিমাণ ছিল খুব বেশি। সম্ভবতঃ রোলার সহযোগে নির্মিত এই যান থেকেই চাকার আবিষ্কার হয়। রোলার ক্ষয়ে ক্ষয়ে চাকতির আকার নিলে তা দেখে কোন একদল পরিশ্রমী আদিম মানুষের মনে প্রথম চাকার ধারণা জন্মায়।

সিদ্ধান্ত

নি র্ম ল কু মা র প্রা মা ণি ক*

মানুষরূপী এই স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক যন্ত্র পুতুলটার অভ্যন্তরে সম্ভবত গুরু মস্তিষ্কের কোন স্নায়ু বর্তনীতে উৎপন্ন হয় এক বিশেষ ধরনের সংকেত (স্নায়ু রাসায়নিক বা বৈদ্যুতিক যে কোন প্রকার হতে পারে) যার জন্যই মানুষ তথ্য সংগ্রহ ও তা থেকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় বা প্রেরণা পায়।

মানুষরূপী এই স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক যন্ত্র পুতুলটার অভ্যন্তরে সম্ভবত গুরু মস্তিষ্কের কোন স্নায়ু বর্তনীতে উৎপন্ন হয় এক বিশেষ ধরনের সংকেত (স্নায়ু রাসায়নিক বা বৈদ্যুতিক যে কোন প্রকার হতে পারে) যার জন্যই মানুষ তথ্য সংগ্রহ ও তা থেকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় বা প্রেরণা পায়। অন্ততঃ সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যে ঘটনার কিছু পূর্ব তথ্য বা তথ্য জাত ধারণা তার স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে না পারা পর্যন্ত বা অনেক সময় কিছু তাৎক্ষণিক আচরণ না করা পর্যন্ত একটা মানসিক চাপ বা যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা বা উদ্বেগ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ বিশেষ আবেগ সৃষ্টিকারী সংকেতকে নিষ্ক্রিয় করার জন্যই যুক্তি স্তরে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু অনুমান ভিত্তিক বা পূর্ব ধারণা প্রসূত কিছু তথ্যকে হাজির করে অন্ততঃ একটা মনগড়া সিদ্ধান্ত আমরা নিয়ে নিই। মানুষের সব রকম ধারণা ভিত্তিক সিদ্ধান্তের মধ্যেই তার সকল সংস্কার, সামাজিক মূল্যবোধ, পাপ-পূণ্য আস্তিক-নাস্তিক ইত্যাদির অস্তিত্ব। তথ্য সংগ্রহ ও তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই প্রবণতাটাই যেন মানুষের কাছে ব্রহ্মাণ্ড রহস্যকে ক্রমপ্রকাশমান করে রেখেছে। এই প্রবণাতাই তাকে আদিম কাল থেকে আজকের মানুষে পরিণত করেছে।

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, প্রকল্প, ধারণা ও ঈশ্বর বিশ্বাস ঃ

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চাই পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ লব্ধ নির্ভূল তথ্য। এখন দেখা যাক তথ্য এর স্বরূপ কি ? মহা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ঘটনাই ঘটে থাকে নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা উপাদানের একত্রীভবন থেকে এবং প্রতি ঘটনা থেকেই এক বা একাধিক ঘটনান্তোর উপাদান নির্গত হয় যার কোন একটি, দুটি বা বহুসংখ্যক অপর কোন এক বা একাধিক ঘটনা ঘটাতে পারে। ঘটনার স্থানগুলি পরমাণুর অভ্যন্তর থেকে মহাজগতের যে কোন ক্ষেত্রে অবস্থিত হতে পারে এবং জীবদেহের বা কোষের অভ্যন্তরের ঘটনাও এর মধ্যে গণ্য হবে। ঘটনা থেকে ঘটনান্তর হয়ে চলেছে অনন্তকাল থেকে এবং চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। সেই ঘটনা প্রবাহের মধ্যেই আমাদের জানা মহাজগতের মধ্যে এই পৃথিবীতে আজকের এই মানুষ ও তার সব কিছু।

কোন একটি ঘটনা ঘটানোর জন্য যখন যে উপাদানগুলি মিলিত হতে চলেছে সেগুলিকে আমরা বলে থাকি উদ্দীপক এবং উদ্দীপকগুলি মিলিত হওয়ার পর যে উপাদানগুলি নির্গত হল সেগুলিকে আমরা সেই মুহূর্তে সাড়া বা response বলে থাকি। অবশ্য পরবর্তী মুহূর্তে যদি ঐ উপাদান (সাড়া) গুলি অন্য কোন ঘটনা ঘটানোর জন্য বিবেচিত হয় তখনই ঐ উপাদানগুলিকে আমরা উদ্দীপক বলে থাকি। আবার অনেক সময় দেখা যায় ঐ উদ্দীপকগুলি কোন বস্তু বা বস্তু সংস্থার উপর প্রযুক্ত হয়ে বস্তুর অভ্যন্তরীন বা বাহ্যিক সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে শোষিত হয়ে গেল বা ঐ সজ্জার পরিবর্তনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেল। ঘটনা উপাদানের ঐ বহমান অবস্থা (উদ্দীপক ও সাড়া) এবং আবদ্ধ অবস্থার মধ্যস্থিত রাশিগুলির পরিমাণগুলিই মূলত নিখুঁত তথ্য।

এখন দেখা যাক ঘটনা উপাদানগুলি কি কি হতে পারে ? — বহমান উপাদানগুলি উদ্দীপক ও সাড়া হিসাবে মূলতঃ নিম্নলিখিতগুলির কোন এক বা একাধিক একসঙ্গে বা আলাদা আলাদাভাবে বিবেচিত হতে পারে —

বল — যান্ত্রিক, মহাকর্ষীয়, তড়িৎ-চুম্বকীয় বা নিউক্লীয় বল।

শক্তি — শক্তি বলতে বিশেষত সমগ্র যান্ত্রিক বা স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের সমগ্র বর্ণালী, লঙ্ ওয়েভ্ বেতার তরঙ্গ থেকে মহাজাগতিক রশ্মির সমগ্র তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালীকে বুঝতে হবে, এবং বস্তুকণা বা বস্তু সংস্থার গতীয় অবস্থা বলতে

* শিক্ষক চৌহাটা উচ্চ বিদ্যালয়, বীরভূম

এখানে বিশাল মহাজাগতিক বস্তু বা বস্তু সংস্থা থেকে পরমাণুর অভ্যন্তরের স্থায়ী ও তাৎক্ষণিক কণা সমূহকে বুঝতে হবে।

অপরদিকে উদ্দীপনার প্রয়োগে বস্তু সজ্জার মধ্যে সার্বিক বা আংশিক পরিবর্তন বলতে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কণা বা কণাগুলির সার্বিক বা আংশিক, স্থানগত, সজ্জাগত, সংস্থাগত বা গতিয় অবস্থাগত পরিবর্তনকে যেমন বিবেচনা করতে হবে, তেমনই বিবেচনা করতে হবে মহাজাগতিক বিশাল বস্তু সমূহের স্থানগত, সংস্থাগত বা গতীয় অবস্থাগত পরিবর্তনকে। সময়কেও একটা ঘটনা উপাদান হিসাবে গ্রাহ্য করতে হবে। কারণ গতি ও সময়ের আপেক্ষিকতার জন্য ও পারিপার্শ্বিক থেকে আসা ঘটনা উপাদানগুলির বিভিন্ন পরিমাপ পরিবর্তনশীল এবং সময়ান্তরের উপর ঘটনার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। আশা করি ঘটনার বিস্তৃতি ও ঘটনা উপাদানের অসীমতা আমরা সকলে কল্পনা করতে পারছি। এর মধ্যে জীব জাগতিক ঘটনা সমূহকে আলাদাভাবে না ধরলে ও চলবে। কেননা জীবজগৎটিও মূলত বিশেষ সাংকেতিক জড় সজ্জারই অন্তর্গত।

জীবদেহ গঠনের জন্য যে একক জীবন সংকেত সমন্বিত জড় সজ্জা সংস্থা কার্যকরী থাকে তাকে কোষ বলে। এই কোষের অভ্যন্তরে D.N.A. অণুর জড় সজ্জার মধ্যেই থাকে তার সামগ্রিক কাজের স্মৃতি ও নিয়ন্ত্রক সজ্জা বা ছক। ঐ D.N.A অণুটি মূলত কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সালফার প্রভৃতি মৌলের পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা গঠিত বৃহদাকার অণু। অণু গঠনে অংশগ্রহণকারী ঐ সব পরমাণু পুঞ্জের সমবায় বা বিন্যাসের মধ্যে এবং ইলেকট্রনীয় কক্ষ সজ্জার মধ্যেই সম্ভবত সামগ্রিক তথ্য ধরা থাকে। কখন, কবে, কোথায় কোন ধরনের উৎস্য থেকে ঐ ঘটনা উপাদান সমূহ ঐ বৃহদাকার অণুটির অভ্যন্তরের সজ্জার পরিবর্তন ঘটিয়ে জীব জাগতিক সংকেতগুলি ধরা পড়েছিল তার খবর আমাদের অজানা। অডিও বা ভিডিও ক্যাসেটে যেমন নানান নাটক ধরা থাকে তেমনই বিভিন্ন ধরনের জীবের সমগ্র জীবন নাটক (দেহগত বা দেহযন্ত্রগত) ধরা থাকে তাদের দেহ গঠনের জন্য দায়ী প্রথম কোষটির D. N. A তে। মানুষের ক্ষেত্রে মাতৃগর্ভে নিষিক্ত ডিম্বানুর মধ্যে অবস্থিত D. N. A তে সমগ্র দেহযন্ত্র ও মনোজাগতিক কম্পিউটার নেট ওয়ার্ক System টি তৈরি করার সংকেত থেকে যায়। পরে কোষ বিভাজনের দ্বারা সেই সামগ্রিক প্রোগ্রামটি বণ্টিত হতে থাকে, বিভিন্ন ধরনের কোষে। এই জীব দেহের অভ্যন্তরেও অসীম সংখ্যক ঘটনা অনবরত ঘটে চলেছে। সেখানেও উদ্দীপক ও সাড়া হিসাবে বিভিন্ন ভাষাকে বহন করে নিয়ে চলেছে উপরিলিখিত ঘটনা উপাদানগুলির কোনটি না কোনটি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন বহিরাগত বা অভ্যন্তরে উৎপন্ন উদ্দীপনাটি কোষের অভ্যন্তরে জড় সজ্জার পরিবর্তন ঘটিয়ে স্মৃতি বা প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে। বংশগতিতে নানান রোগ বা নানান পরিবর্তন বা জেনিটিক্ কোডের এই পরিবর্তনও ঐভাবে হতে পারে।

যে কোন ধরনের ঘটনা উপাদান দ্বারা যদি কোন বস্তু সংস্থার সজ্জার পরিবর্তন সাধিত হয় তখন ঐ বস্তু সজ্জার মধ্যেই ঘটনা উপাদানগুলির মধ্যস্থিত পরিমাপ যোগ্য রাশিগুলি লীন অবস্থায় বিরাজ করে। যদি কোন ক্ষেত্রে ঐ বস্তু সজ্জার বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় তবে পরোক্ষে ঐ ঘটনা উপাদানগুলির মধ্যস্থিত রাশিগুলিকে জানতে পারবো বা তার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবো, অর্থাৎ আবদ্ধ হওয়া তথ্যকে পড়তে পারবো। যদি কোন পরমাণু কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ শোষিত হয়ে তার কক্ষস্থিত ইলেকট্রনের শক্তি স্তরের পরিবর্তন হয়, এবং যদি আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় অথবা আমাদের তৈরী কোন যন্ত্রের সাহায্যে ঐ শক্তিস্তর পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হই তবে ঐ তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মধ্যস্থিত শক্তি বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা জানার জন্য অনেক সময় আমরা ধ্বংস স্তূপ খনন করি এবং ঘটনা উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করি। এখানেও সেই আবদ্ধ তথ্যকে পাঠ করার প্রচেষ্টা। আবার ভূতাত্ত্বিকদের পুরাতন ঘটনার তথ্য পাওয়ার জন্য ও বস্তু সজ্জা পাঠ করার চেষ্টা করতে হয়। তাছাড়া গ্রামোফন রেকর্ড, ক্যাসেট বা স্মৃতি Chip গুলিতে বস্তু সজ্জার পরিবর্তন দ্বারাই উদ্দীপনা সমূহকে ধরে রাখা হয়। তবে ঐ ধরনের স্মৃতি যন্ত্রগুলি যেহেতু আমাদের তৈরী তাই ওগুলি পাঠ করার যন্ত্রগুলি ও আমাদের হাতে থাকার জন্যই খুব সহজে আমরা ঐগুলিকে পাঠ করতে পারি। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বা দেহের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে থাকা স্নায়ুবর্তনী সমূহের গ্রাহক যন্ত্রগুলির সাহায্যে যে সমস্ত উদ্দীপনা নার্ভ impulse হিসাবে মস্তিষ্কের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রকের সাহায্যে নির্দিষ্ট স্মৃতি যন্ত্রগুলিতে রেকর্ড হয় সেখানে ও উদ্দীপনার প্রকৃতি অনুযায়ী D. N. A. Net Work এর সহয়োঘিতায় স্নায়ুবর্তনী বা স্নায়ু-সন্ধি অঞ্চলে নানান জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের ভিত্তিতেই খবর ধরা থাকে। এমন কোন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে বস্তু সজ্জাগত পরিবর্তন ছাড়া তথ্য ধরা থাকতে পারে। অবশ্য মনোবিজ্ঞানে স্মৃতিকে একটি প্রক্রিয়াবলে ধরা হয় যার মধ্যে শিখন, সংরক্ষণ ও স্মরণ সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে স্মৃতি বলা হয়। এখানে তথ্য এর সংরক্ষণ অবস্থাকে আমরা স্মৃতিযন্ত্র বলেই ধরবো। লিখন ও পঠন ক্রিয়াটি কোন নিয়ন্ত্রক স্মৃতি চালিত যন্ত্রের কর্ম বলে ধরবো।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ঘটনার অসীমতা তথা তথ্য এর বহমান অবস্থা (উদ্দীপক ও সাড়া) এবং তথ্য আবদ্ধ বা স্মৃতি অবস্থার ক্ষেত্র কি বিশাল সেটা নিশ্চয় কিছুটা অনুমান করতে পারা যাবে।

মহাবিশ্বে প্রকৃত সত্য বা চরম সত্যটি কি ?— যদি কোন এক বা একাধিক ঘটনা উপাদান বার বার সবদিক থেকে একই রকম পরিমাপ যুক্ত হয়ে মিলিত হয় তবে বার বারই ঘটনাটি একই রকম ভাবে ঘটবে, এবং প্রতি ক্ষেত্রেই সময়কে একটা উপাদান হিসাবে গণ্য করতে হবে। কারণ অনেক ঘটনা উপাদানের উৎস পারিপার্শ্বিক বস্তু সজ্জা ও তার গতিয় অবস্থা এবং সময়ের সাপেক্ষে ঐ সজ্জার বা গতির অবস্থার *পরিবর্তনের জন্য ঘটনা উপাদানগুলির কোন একটি বা* একাধিকের মধ্যস্থিত রাশিগুলির পরিমাপ পাল্টে যেতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি কোন ঘটনা তার নিজের ইচ্ছা মতো ঘটাতে চায় তবে প্রতিটি ঘটনা উপাদান তার আয়ত্বাধীন থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট ক্রম ও সময়ান্তর অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করে ঘটনা উপাদানগুলি প্রয়োগ করতে পারলে তবেই ঘটনাটি তার ইচ্ছাধীনে ঘটবে। নতুবা ঘটনার গতি প্রকৃতি পাল্টে যাবে। অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে যে ঘটনা উপাদানগুলি সব সময়ই নিখুঁত পরিমাপ যুক্ত হতে হবে। পরিবর্তন কেন অনেক ক্ষেত্রে গৃহীত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যোগ্য ? — এর উত্তরে বলা যায় — মূলত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ঘটনা উপাদানগুলিকে আমাদের সনাক্ত করতে হয়। এ ব্যাপারে প্রথমে আসা যাক তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের কথায়।, আমাদের চোখে কেবলমাত্র 700 মিলি মাইক্রন থেকে 400 মিলি মাইক্রন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে। চামড়ায় 3×10^{6} মেগাহার্টজ থেকে 3×10^{8} মেগাহার্টজ পর্যন্ত তাপবাহী তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। অথচ তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বর্ণালীর বিস্তার মোটামুটি 1000 কিমি থেকে 10^{-4} মিলি মাইক্রন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত। শ্রবণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় মাত্র 20HZ থেকে 20(KHZ) কিলো হার্টজ পর্যন্ত যান্ত্রিক বা স্থিতিস্থাপক তরঙ্গে উদ্দীপ্ত হয়। অথচ যান্ত্রিক তরঙ্গের বিস্তার এক হার্টজ থেকে কয়েক হাজার কিলোহার্টজ পর্যন্ত। জিহ্বে মাত্র কয়েক ধরনের পদার্থের ঝাল, নোনতা, মিষ্টি, টক ইত্যাদি স্বাদ পেতে পারি। নাক খুব সীমাবদ্ধ কয়েকটি গ্যাসের গন্ধ সনাক্ত করতে পারে। চামড়া বা স্পর্শ ইন্দ্রিয় মাত্র কয়েক হার্টজ থেকে কয়েক শত হার্টজ পর্যন্ত যান্ত্রিক তরঙ্গে উদ্দীপ্ত হয় কিন্তু সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে খুব স্বল্প বিস্তারে। যদি চাপ বা যান্ত্রিক বলের কথা ধরা যায় তবে দেখা যায় একটি নির্দিষ্ট চাপের কম হলে আর চাপে অনুভূতি সৃষ্টি হয় না। আবার একটি নির্দিষ্ট চাপের অধিক হলে সংশ্লিষ্ট স্নায়ু সংযোগ ব্যবস্থা বা কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথচ ক্ষেত্র বিশেষে চাপের মান শূন্যের খুব কাছাকাছি থেকে অসীম পর্যন্ত হতে পারে।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য উপরোক্ত ঘটনা উপাদানস্থিত রাশিগুলির বিস্তৃতির মান ব্যক্তি ভিত্তিক সামান্য বিবর্তনশীল হতেও পারে এবং মনুষ্যতর বহু জীবের ক্ষেত্রে দেখা যায় উপরোক্ত ঘটনা উাপদানস্থিত রাশিগুলির অনুভূতির বিস্তার নীচের অথবা উপরের দিকে মানুষের থেকে কিছু বেশি এবং ঘটনা উপাদানের সংখ্যার দিক থেকেও অনুভূতির পরিমাণ বেশি। তাই তথ্য পাওয়ার জন্য মানুষ আদিম কাল থেকে মানুষেতর প্রাণীদের ব্যবহার করে আসছে। আবার বর্তমানে নানা ধরনের ট্রান্সডিউসার আবিষ্কার হওয়ার ফলে বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপনাকে তড়িৎ উদ্দীপনায় পরিবর্তন করা সহজ হচ্ছে। গড়ে উঠেছে নানান ধরনের তথ্য প্রক্রিয়া ও তথ্য পরিবর্তক *বা তথ্যগণক। প্রতিদিন মানুষের তথ্যের ভাণ্ডারকে* সমৃদ্ধ করে চলেছে আধুনিক নানান যন্ত্র। কিন্তু ঘটনা ও ঘটনা উপাদানের অসীমতার তুলনায় তা খুবই সামান্য। দেহের অভ্যন্তরেই হোক বা জড় জগতের যে কোন স্থানেই হোক কোন ঘটনা উপাদানের সংযোজন বিয়োজন বা ঐ গুলির নানা ধরনের বিন্যাসই ঘটনার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। এবং প্রতি ক্ষেত্রেই ঘটনার স্বরূপ কিন্তু বিশুদ্ধ গণিতের নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ঘটনার অনেক তাৎক্ষণিক উপাদানগুলির মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক হয় পর্যবেক্ষণের বাহিরেই থেকে যায় নতুবা পরিমাপ করা সম্ভব না হওয়ায় কতকগুলি ক্ষেত্রে রাশি বিজ্ঞানের সাহায্যে তথ্য যোগাড় করতে হয়, তাই তথ্যগুলি সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত থাকে না। এই ক্ষেত্রগুলি থেকে গৃহীত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হয়তো কিছু দিন পর বদলাতে হয়। আজ যে আবিষ্কারকে জীবনদায়ী বলে মনে করা হচ্ছে ঘটনান্তোর তথ্য আগামীকাল তাকে বদলাবার প্রেরণা যোগাচ্ছে। তাই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে সংশোধনের প্রয়োজন দেখা যায়। আসলে পরম তথ্য ছাড়া কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত চরম স্থায়ী হতে পারে না। তবু মানুষ সেই আদিমকাল থেকে বিভিন্ন আপাতগ্রাহ্য তথ্যের সাপেক্ষে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক বহু সমস্যার সমাধান করে আসছে এবং তা ভবিষ্যতেও করতে হবে। এইভাবে সংশোধন ও ভুলের সাহায্যে আদিম কালের মানুষ আজকের মানুষে পরিণত হয়েছে।

অনেক সময় পূর্বের গৃহীত কিছু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সাপেক্ষে যুক্তিভিত্তিক অনুমান এবং পরোক্ষ ঘটনান্তোর পর্যবেক্ষণ দ্বারা সেই অনুমান সমর্থিত হলে সেই ধরনের সিদ্ধান্তকে আমরা প্রকল্প বলে থাকি।

এখন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এই ধরনের সিদ্ধান্তকে আমরা idea বা ধারণা (concept) ইত্যাদি বলে থাকি। এই পৃথিবীর প্রায় সকল ধরনের মানুষ সেই ধরনের সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ে থাকেন। এইসব ক্ষেত্রে গৃহিত সিদ্ধান্তগুলির পিছনে কিছু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কিছু অসম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ, কিছু অনুমান বা বহু যুগ থেকে চলে আসা কাল্পনিক কাহিনী নির্ভর অমুমান প্রভৃতি কার্যকরী থাকে। মূলকথা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অধিকাংশ তথ্য পরিমাপ পদ্ধতিতে যাচাই করা নয়।

ধারণাজাত সিদ্ধান্তগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বে প্রচলিত অনেক ধারণা এবং বর্তমানের কিছু পর্যবেক্ষণ এবং অনেক সময় কিছু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বা প্রকল্পের বা অন্য কোন ধারণাজাত তথ্যের মিশ্রণ বা সমবায় ও বিন্যাসে গড়ে ওঠে। এই ধরনের সিদ্ধান্তের কোন বিশুদ্ধ গাণিতিক সূত্র তৈরি করা সম্ভব নয়। তবে কখনও কখনও প্রয়োগ সাফল্য পাওয়া যায়। এই তৃতীয় ধরনের সিদ্ধান্তই আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার ব্যক্তিগত সম্পর্ক এমন কি মনোজাগতিক ও বাহ্যিক আচরণের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রক। এই ধরনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত ঘটনা উপাদান স্থিত রাশিগুলির পরিমাপ করা খুব মুশকিল এবং বহু ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। তাই এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলি অধিক মাত্রায় পরিবর্তনশীল। প্রেম প্রীতি স্নেহ ভালোবাসা ঘৃণা মানবিক গুণ বা মূল্যবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলি মূলত ধারণাজাত পরিবর্তন। আস্তিক-নাস্তিক, বিশ্বাস-অবিশ্বাস সহ একটা ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব, অহংবোধ, বিবেক ইত্যাদি সব কিছুই ধারণাজাত সিদ্ধান্তের প্রকাশ। আজকের আমি আর গত কালের আমি এবং আগামী কালের আমি এক নাও থাকতে পারি।

যে কোন ধরনের দার্শনিক সিদ্ধান্তও ধারণার অন্তর্গত। ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের বিশ্বাস – অবিশ্বাস, ধর্ম-অধর্ম, জন্মান্তর, ভৌতিক বা অলৌকিক ক্রিয়া কলাপে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস প্রভৃতি হাজারো রকমের সংস্কার এবং তাকে ঘিরে নানান ধরনের গল্প কাহিনী বা উপন্যাস বা ঐ সবকে ঘিরে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা এ সবই নানান ধরনের ধারণাজাত সিদ্ধান্তের ফল। ব্যক্তি মনোজগতে পারিপার্শ্বিকতা থেকে প্রাপ্ত নানান তথ্য জমা হতে থাকে। সেগুলির নানা ধরনের বিন্যাস সমবায়ে যে ধারণা গড়ে উঠে সেগুলি শুধু ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণই নিয়ন্ত্রণ করে না শরীরের গভীরে অবস্থিত নানান তন্ত্রের উপরও ক্রিয়া করে। এ ছাড়া নানা ধরনের আবেগের বশবর্তীও হতে পারে সেই ব্যাক্তি। ধরা যাক একটি ঘরে দুটি লোক আছে তার মধ্যে একজন এমন সব তথ্য পেয়েছে যা থেকে তার ভূতের ধারণা দৃঢ় মূল হয়েছে এবং অপর ব্যক্তি তার বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা থেকে এমন সব তথ্য পেয়েছে যাতে তার ধারণা হয়েছে যে ভূতের ধারণাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এখন অন্ধকার রাত্রিতে যদি দমকা হাওয়ায় ঘরের দরজা-জানালা হঠাৎ খোলাবন্ধ হতে থাকে তবে দুজনের প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় বিভিন্ন হবে।

এমন হতে পারে ধর্মীয় গোঁড়ামীর জন্য গোমাংসের নাম শুনলেই কারও বমনের উদ্রেক হয়। তার মস্তিষ্কে স্মৃতি, নিয়ন্ত্রণ ও প্রসেসিং নেট ওয়ার্কটি এমন ভাবে প্রোগ্রাম হয়েছে যে কানে ঐ নির্দিষ্ট তথ্যটি পৌছানো মাত্রই সেই উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় প্রসেসর বা ক্রিয়া বিভাগে পৌছানো এবং নিয়ন্ত্রক ও স্মৃতি সংস্থার সহায়তায় সংকেত তৈরী হয়ে সেই সংকেত বমন কেন্দ্রের মারফৎ বমি হওয়ার জন্য দায়ী শ্রুতিবর্তী বর্তনীটিকে সক্রিয় করে দেয়। অর্থাৎ একটি বিশেষ ধারণার জন্য দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত viceral system এর উপরও প্রভাব ফেলতে পারে ছোট একটা কথা। যার মূলে কাজ করছে একটা ধারণাজাত সিদ্ধান্ত। সেই ব্যক্তিকে যদি শারীরবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে মাংস বা মাংস তন্তুর গঠন উপাদান বোঝানো হয় তবুও তার ধারণা কাটতেও পারে আবার নাও পারে। ধর্মীয় গোঁড়ামীর অসারতা উপলব্ধি করার মতো উপযুক্ত তথ্য তার যুক্তি স্তরে পৌছাতে পারলে গোমাংসের নামে বমি হওয়ার মত অবস্থাটা কেটে যেতে পারে। অনেক সময় আমরা 'গোঁয়ার' কথাটা বলে থাকি যার অর্থ গোঁ আছে, অর্থাৎ যারা এক বা একাধিক নির্দিষ্ট ধারণাকে চরম সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে সেই সম্পর্কে আর কোন চিন্তা ভাবনা করতে চায় না বা মানসিক ভাবে কুঁড়ে হয়ে পড়ে। তবে সেই ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে তাঁর যদি কোন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে উচ্চ ধারণা থাকে বা তাঁকে বিশ্বাস করে অথবা শ্রদ্ধা করে তবে তাঁর মুখ নিসৃত বাণীতেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ধারণা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।

ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষ শিশু কাল থেকে তার প্রিয়জন, শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নানান ধরনের তথ্য পেতে থাকে তার ফলেই সেই সম্পর্কে মানুষের মনে একটা ধারণা গঠিত হয়ে যায়। অনেক সময় কিছু যুক্তি ভিত্তিক তথ্য সে পেলেও ঐ প্রিয়জনের বিভিন্ন স্মৃতি ও তার প্রতি শ্রদ্ধাজনিত আবেগ তার চিন্তা ভাবনার সময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাহায্যে তুলনা করার জন্য পূর্ব স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করে এবং তাৎক্ষণিক ভাবে আসা তথ্যকে মিলিয়ে ভাবনা চিন্তার প্রক্রিয়াটিকে প্রায় নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে নতুন কোন ধারণামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষের আদিম কাল থেকেই তথ্য পাওয়ার অভাব রয়েছে কারণ পূর্বেই বলেছি বহু ঘটনারই ঘটনা উপাদান ইন্দ্রিয়োত্তর পর্যায়েই থাকে। তার জন্যই ঘটনাগুলি বুদ্ধিত্তোর। অথচ বুদ্ধিমূলক কাজকর্ম বা ভাবনা চিন্তা বা পূর্ব তথ্যের সাপেক্ষে নতুন আসা তথ্যকে তুলনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা তার যেন একটা সহজাত প্রবৃত্তি, যাকে আমরা কৌতূহল প্রবৃত্তি বলে থাকি। এই কৌতূহল প্রবৃত্তির জন্য সে তথ্যকে পেতে চায় এবং সিদ্ধান্ত নিতে চায় বা ধারণা গঠন করতে চায়। অথচ তার ইন্দ্রীয় উদ্দীপন বর্ণালী খুবই সীমাবদ্ধ পরিসরে বিস্তৃত। তাই বুদ্ধিত্তোর ঐ সব ঘটনার জন্য মানুষ এক বা একাধিক কাল্পনিক ব্যক্তিকে ঐ সমস্ত ঘটনা উপাদানের উৎপাদক ও নিয়ন্ত্রক হিসাবে কল্পনা করতে বাধ্য হয়েছে। আজও জড় জগতের বহু ঘটনা এমনকি এই মানব দেহরূপ ছোট মহাজাগতিক মেশিনটার মধ্যেই বিভিন্নতার মধ্যে সমন্বয় সাধক স্থানীয় ও সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র সমূহের পরিকল্পিত প্রোগ্রাম ব্যবস্থা ও জীবদেহ গঠনের

সামগ্রিক তথ্য সম্পন্ন D. N. A. অণুর মধ্যে সামগ্রিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রক Net Work টি প্রায়ই বুদ্ধিতর পর্যায়েই রয়ে গিয়েছে। জীবাশ্ম ও প্রজনন বিজ্ঞানের পাওয়া কিছু তথ্য দ্বারা সমর্থিত বা পরিব্যক্তির উদাহরণ দ্বারা সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক নির্বাচন ও বিবর্তনের তত্ত্বে প্রচুর ফাঁক ফোঁকর রয়েই গিয়েছে। তবে এক কালের বেশ কিছু অজানা ঘটনা উপাদানের তথ্য মানুষ পেয়েছে এবং বিশ্লেষণ যোগ্য ঐ সব ঘটনার ক্ষেত্র থেকে ঈশ্বর ধারণা কিছুটা দূরে সরে গেলেও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নি। বিশ্লেষণী মনোভাব বা বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বয়বৃদ্ধির জন্য স্বাভাবিক পরিণামেই মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ু network টি ও সংলগ্ন জৈব রাসায়নিক চক্র সমূহের সক্রিয়তা হ্রাস পায়। তার জন্য পূর্ব স্মৃতি থেকে তথ্যকে এবং নতুন আসা তথ্যকে সঠিকভাবে সব সময় যুক্তিস্তরে বিচার বিশ্লেষণের জন্য মেলাতে পারে না। এ ছাড়া সাধারণ পারিবারিক জীবনে অভ্যস্থ এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্নেহাস্পদের সংখ্যা বৃদ্ধি বা মোহ বৃদ্ধি জনিত কারণে এবং বার্ধক্যে নানান চাওয়া পাওয়ার হিসাব মেলাতে গিয়ে বিজ্ঞান মনস্কতার কিছু অবক্ষয় অনভিপ্রেত নয়।

অসীম ঘটনা রাজ্যের অসীম ঘটনা উপাদানের মধ্যস্থিত রাশিগুলির সামগ্রিক তথ্য যদি কোনদিন মানুষের হাতে আসে সেদিন হয়তো বা ঈশ্বরের ধারণা বা বিশ্বাস সম্পূর্ণ রূপে বিদায় নিতে পারে। রহস্য যেমন বিশাল জড় ব্রহ্মাণ্ডের অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত তেমনই মানব দেহরূপ এই ছোট মহাজাগতিক মেসিনটির রসস্যের অসীমতা আজও কিছু কমে যায় নি। কিন্তু মানুষের কৌতূহল প্রবৃত্তি তাকে ঘটনা উপাদানগুলিকে সনাক্ত করার জন্য এগিয়ে নিয়ে যাবেই। যদি সত্যই সে কোনদিন ঐ সমস্ত রহস্যের প্রতি ঘটনার উপাদান সনাক্ত করে তাদেরকে বিশুদ্ধ গণিতের সূত্রে আবদ্ধ করতে পারে তবে সেদিন সে সৃষ্টি করতে পারবে জীব ও জড় ব্রহ্মাণ্ডের ইপ্সিত সব কিছু।

With Best Compliments From :—

You've known us as IOL Limited or Indian Oxygen. We have changed our name to BOC India. Partly to reflect our long-standing membership in the worldwide BOC Group. Partly to make life slightly simpler for those customers who do business wih us in five continents.
But mainly to signal our commitment to delivering the same high quality products and services to customers — large and small — everywhere we operate. **Now meet us as BOC India.**

60 YEARS SERVICE TO THE NATION
IOL Limited
IS NOW
BOC India Limited

INDUSTRIA GASES • SPECIAL GASES • MEDICAL GASES
CRYOGENIC EQUIPMENT • PIPELINE DELIVERY SYSTEMS
CONTRACTS • HEALTH CARE PRODUCTS

BOC

Clarion 3EIE09

করবেন। এই মন নিয়েই তিনি বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদে ঢুকে পড়লেন, ভাল জাতের গবেষণার জন্য পরিষদের বেশ নামডাক আছে, কাজল তো এখানেই —, কিন্তু সময়কালটি যে সুবিধের নয় ! প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্পেনে আগের কৌলিন্য আর নেই। রাজনৈতিক ঝড়ঝাপ্টা সমানে চলেছে, গৃহযুদ্ধের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে স্পেন। এখন এখানে কাল কাটানো মানেই মৃত্যু যে কোনও সময়েই। জার্মানি পালালেন গা ঢাকা দিয়ে। ভাগ্য যে ভাল সে আর বলতে হয় না – কারন কাইজার উইলহেম ইনস্টিটিউট ফুয়ার মেডিজিনিৎস - এ এসেই দেখা হয়ে গেল অটো মেয়ারহফের সঙ্গে। মেয়ারহফ তখন সবে নোবেল পেয়েছেন চিকিৎসায় অসাধারণ কাজের সুবাদে, গবেষণা করে দেখিয়েছেন শরীরে অক্সিজেন খরচ হয় পেশির উৎপন্ন ল্যাকটিক অম্লের সঙ্গে যোগসূত্র রেখেই। মেয়রহফের কাছেই জীব রসায়নের প্রকৃত হাতে খড়ি হল তাঁর, শিখলেন শারীরবৃত্তীয় কুয়াশায় কি ভাবে রসায়নের গভীর পথঘাট চিনে নিতে হয়।

কিছুদিন জার্মানিতে যেন স্বপ্নের মত কাটলো, এরপর এলেন গ্রেট ব্রিটেনে, সেখানেও কাজ করলেন এখানে সেখানে কিন্তু এভাবে কি তৃপ্তি আসে ? সোজা চলে এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে — ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে (সেন্টলুই) শারীরবিদ্যার প্রশিক্ষক ও গবেষণা সহকারী হয়েই। এখানে প্রসঙ্গত বলা দরকার যে অচোয়া যখন ব্রিটেনের অক্সফোর্ডে, তখনই জারণ শ্রেণীর বিপাক ক্রিয়ার এনজাইমের যন্ত্র কৌশল সম্পর্কিত কাজের নাড়া বাঁধেন তিনি। এ ব্যাপারে তাঁকে অশেষ প্রেরণা যুগিয়েছেন যশস্বী অধ্যাপক ও বিরল শ্রেণীর গবেষক ডাঃ আর. এ. পিটার্স। তিনি অচোয়াকে শিখিয়েছেন শরীরে ভিটামিন বি শ্রেণীর রাসায়নিকগুলির কাজের পরখ করার উপায়।

সেই উৎসাহ-ই উদ্দীপনা নিয়ে এল, যখন তিনি মার্কিন মূলুকে এসে গবেষণার ভিয়েনের সামনে দাঁড়ালেন। কিন্তু যে কাজের গোড়াপত্তন করতে চান, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার উপযুক্ত বাতাবরণ নেই। ফলে একবছরও গেলনা, চলে এলেন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে। কাজের মত কাজ নিয়ে এগোলেন এখানেই। জীবরসায়ন বিভাগ এখানে তাঁর হাতেই একটা বিপ্লবে উত্তীর্ণ হল। মাত্র বারো বছরের মধ্যেই, উনিশশো চুয়ান্নতে তিনি জীবরসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যানও হলেন। নিউইয়র্কে এসেই অচোয়া গবেষণার যে নতুন হালখাতা খুললেন তা হল পলিনিউক্লিওটাইডের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূতো কোষে কাজটা যে করে তা কি ধরনের ! বাইরে থেকে ওই সূতোগুলো গড়ে জীবকোষে সঞ্চালনের পর তারা কি আর. এন. এ তৈরি করবেই ? যদি তাই-ই হয় অর্থাৎ পলিনিউক্লিওটাইড সূতোয় আর. এন. এ (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড)-র নতুন পলিনিউক্লিওটাইড সূতো তৈরী হয়, তবে তো অন্তর্গত পথের খবর্দারি এনজাইমের-ও টিকি ধরা সম্ভব।

কিন্তু কি ধরনের কোষ নিয়ে কাজ শুরু করবেন তিন ? মিয়েশ্চার তো বেশ এগিয়েছিলেন স্যামন মাছের শুক্রকোষ নিয়ে, তিনি এগোবেন কি করে ? অনেক ভেবে একধরনের জীবাণু নিলেন পথের পাথেয় হিসেবে। অ্যাজোব্যাকটার জাতীয় ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়া জীবাণুর বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার ঘটে বেশ দ্রুত তালে। বৃহদায়তনে তৈরি করে, গবেষণার পর্যাপ্ত পাথেয় তৈরি করা চাই যে। ব্যাকটেরিয়ার কালচার (উপযুক্ত জৈব মাধ্যমে) তৈরি করে টানা পনেরো ঘণ্টা রেখে ছিলেন, অবশ্যই ঘরের তাপমাত্রায়। তারপর দেখছেন বাপ্‌রে বংশ ! গোটা কালচার-ই থিকথিক করছে জীবাণুতে। এবার ওই জীবাণু (কালচার) তুলে নিলেন একটি শক্ত ও পরিষ্কার পরীক্ষানলে। পরীক্ষানলটি সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে প্রচণ্ড ঘোরালেন, ঘোরার ঠেলায় (মিনিটে বিশ হাজার বার) কোষের ভেতরের অংশ বাইরে চলে এল। তারপর যন্ত্র থেকে থকথকে অংশ এনে মর্টারে খুব মাড়লেন। মাড়াই করে এবার উপযুক্ত দ্রাবকে ধুচ্ছেন, এক-দুই-তিন - - - ধোওয়া ও ঘোরানোর পালা চলছে সমানে। তারপর নানা কঠিন ও আয়াসসাধ্য পথে সেই অংশটি নানা রাসায়নিকের সঙ্গে মেশালেন (সব বলা সম্ভব নয়, মহাভারত হয়ে যাবে যে)। উদ্দেশ্য একটাই, এনজাইমকে যে করেই হোক আলাদা করতেই হবে। অবশেষে মেওয়া ফলে, এনজাইম পেয়ে গেলেন অচোয়া, হ্যাঁ-হ্যাঁ-বিশুদ্ধভাবেই।

এ তো গেল প্রথম পর্বের সমাপ্তি, এবার দ্বিতীয় পর্ব। এই দ্বিতীয় পর্বেই তো কোষীয় গভীরতায় ঢুকবেন অচোয়া। পরখ করবেন প্রকৃত আলো, কিন্তু কিভাবে ছক গড়বেন তাও তো ভেবে নিতে হবে ! প্রথমে এক শক্ত, শুষ্ক ও পরিষ্কার পরীক্ষা নলে সামান্য ক ফোঁটা এনজাইম (যা প্রথম পর্বেই আলাদা করেছেন) ঢেলে দিচ্ছেন এডেনোসিন ডাই-ফসফেটের দ্রবণে। তারপর উপযুক্ত জৈবিক বাতাবরণে রেখে অপেক্ষা করছেন কিছুক্ষণ। প্রতীক্ষার ফল ফলছে ধীরে ধীরে। হুর্‌ রে ! আনন্দে নাচ্ছেন অচোয়া-ঐ তো দিব্যি সূতোর মত পদার্থ ভেসে উঠছে অণুবীক্ষণে। সন্দেহ কি তা পলিনিউক্লিওটাইড, যেখানে সূতোর সব 'ফুল'ই অ্যাডেনাইলিক অ্যাসিড। অর্থাৎ পলিমার (মালা) একই ধরনের নিউক্লিউটাইডের (ফুল) ফসল, বা পলি-'এ'।

ধরি ওই মালাটির রং নীল।

অচোয়া ও তাঁর সাথীরা আবার পরীক্ষানল নিচ্ছেন, এবার এ.ডি.পি (অ্যাডেনোসিন ডাই ফসফেট) নয়, নিয়েছেন সাইটোসিন ডাই ফসফেট (সি. ডি. পি)-এর দ্রবণ, তারপর ক-ফোঁটা প্রথম পর্বের এনজাইম ঢেলে ও পরীক্ষানলটি উপযুক্ত বাতাবরণে রেখে অপেক্ষা। বলা বহুল্য পেয়ে গেলেন পলি 'সি'।

ঠিক একই ভাবে ইউরিডিন ডাই ফসফেট (ইউ. ডি. পি)-এর দ্রবণে প্রথম পর্বের এনজাইম মিশিয়ে পেয়ে গেলেন পলি-'ইউ' বা পলি-'য়্যু'। কিন্তু গুয়ানোসিন ডাই ফসফেট (জি. ডি. পি) নিয়ে এগোতেই ধাক্কা খেলেন, কিছুতেই পলি-জি পাওয়া গেল না।

সূতোগুলোর চেহারাগুলো জানতে হবে আগে, তারপর আবার এগোবেন। ওয়াশিংটনে জাতীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রয়েছে পুরনো বন্ধু আলেকজান্ডার রিচ. ওর কাছেই সূতোগুলো পাঠানো হল। সঙ্গে গেল চিরকুট 'সুতোগুলোর চেহারা জানতে চাই, এবং চট্ জলদি)। রিচ এক্স রশ্মি সূতোগুলোতে ফেলে ফেলে বিক্ষেপণ দেখছেন, দেখতে দেখতে গোঁফের ফাঁকে এক ফালি হাসি হাসছেন, তারপর এক টুকরো কাগজ লিখছেন —

'- - - - এই সূতোগুলো হুবহু রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড, যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। চিঠি পড়ে অচোয়া অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্-এর মুখে মুখে একটা চমৎকার রোদ ঘুরে গেল। কিন্তু এখানেই যদি সন্তুষ্টি আসে, তবে যে সর্বনাশ ! বহু দূরের পথ হাঁটতে হবে এখনও। এবার তাঁরা 'দাবায়' নতুন ছক সাজালেন। এক পরীক্ষানলে ক' ফোঁটা পলি-'এ'-র দ্রবণে মেশালেন ক' ফোঁটা পলি-'য়্যু', তারপর কি হয় কি হয় দেখতে দেখতে চোখে তাঁদের আলোর ঝিলিক বার হল — 'এক্কি দ্রবণের ঘনত্ব যে ক্রমশঃই বাড়ছে, এতটা ঘন তরল তো আগে ছিল না' সন্দেহ কি, তলে তলে কিছু একটা নিশ্চই হয়ে গেছে। অতএব তরলটি এখনই ওয়াশিংটনে রিচের কাছে পাঠাও।

তরল চলে যাবার কদিন পরেই রিচের টেলিফোন—

- তোমরা যে ঘনতরলটি ক'দিন আগে পাঠিয়েছ, সেখানে একরশ্মি ফেলে অদ্ভুত একটা দৃশ্য বার করেছি'

— 'কি- কি দৃশ্য'। অপর প্রান্তে অচোয়া উত্তেজনায় কাঁপছেন।

— 'সেটাই তো বলছি হে, পলি 'এ' আর পলি 'য়্যু' সূতো দুটো পরস্পরকে এমন জড়িয়ে ধরেছে ঠিক যেন মনে হচ্ছে—

— 'কি মনে হচ্ছে !'

— 'ঠিকি যেন পাকানো দড়ি, অথবা বলতে পারো ঘোরানো সিঁড়ি।

টেলিফোনের লাইন কেটে গেল, অচোয়ার-ও মনের কুয়াশা কেটে নতুন আলো উঠল। তারও বেশ ক'বছর পরে গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাভেন্ডিস ল্যাবে দুই বিজ্ঞানী ওটসন ও ক্রিক ডি. এন. এ-র পাকানো দড়ির মডেলটি বার করে সারা জীববিদ্যার গবেষণায় একটা তোলপাড় তোলেন — এক মহাদিগন্তর মুখোমুখি দাঁড়ায় বিজ্ঞান গবেষণা।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্ পরিচালিত নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

অমূল্যধন দেব স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বিষয় ঃ আধুনিক ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা

(দু'হাজার শব্দের মধ্যে)

* * * * * * * *

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন

কুমার কৃষ্ণ বসাক স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বিষয় ঃ আধুনিক প্রযুক্তি ও সমাজ

(দু'হাজার শব্দের মধ্যে)

উভয় প্রবন্ধ পাঠাবার শেষ তারিখ ঃ— **31শে মে, 1996**

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা – ৭০০০০৬

সুন্দরবন কুসংস্কার

নকুল চট্টোপাধ্যায়*

বলা বাহুল্য দারিদ্র সুন্দরবনের মানুষের নিত্য সহচর। তাই সুন্দরবনের একটা বড় অঙ্কের মানুষ পেটের জ্বালা নিবারণের জন্য বাঘ, কুমীর, কামট, সাপের ভয় উপেক্ষা করে; নদী-নালা ঘেরা ভয়াল-ভয়ঙ্কর অরণ্যের গহনে ছুটে যায় মাছ, মধু, কাঠ প্রভৃতি আহরণের জন্য। তাই এই ভয়াল-ভয়ঙ্কর পরিবেশে চলতে গিয়ে মানুষের নিত্য সাথী হয়ে দাঁড়িয়েছে নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস।

সুন্দরবনের কথা উঠলেই আমরা মনে করি গভীর জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার ওৎ পেতে বসে আছে শিকার ধরার জন্য। কিন্তু এই ধারণা আদৌ ঠিক নয়। অসংখ্য দ্বীপের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে সুন্দরবন। নদী-নালা, জলা-জঙ্গলে ঘেরা কতগুলি দ্বীপে যেমন রয়েছে বাঘ-হরিণ, কুমীর-কামট, শূকর, বাঁদর-সাপ-পাখির সমাজ — তেমনি কতগুলি দ্বীপে রয়েছে মানুষের সমাজ।

বলা বাহুল্য দারিদ্র সুন্দরবনের মানুষের নিত্য সহচর। তাই সুন্দরবনের একটা বড় অঙ্কের মানুষ পেটের জ্বালা নিবারণের জন্য বাঘ, কুমীর,কামট, সাপের ভয় উপেক্ষা করে, নদী-নালা ঘেরা ভয়াল-ভয়ঙ্কর অরণ্যের গহনে ছুটে যায় মাছ, মধু, কাঠ প্রভৃতি আহরণের জন্য। তাই এই ভয়াল-ভয়ঙ্কর পরিবেশে চলতে গিয়ে মানুষের নিত্য সাথী হয়ে দাঁড়িয়েছে নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস, তুক-তাক, মাদুলী-তাবিজ প্রভৃতি।

কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের পাশাপাশি সুন্দরবনের সমস্ত ধর্মের মানুষ ভয়াল-ভয়ঙ্কর পরিবেশের ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কায়, বিশেষ করে বাঘের ভয়ে বনের দেবী বনবিবির আরাধনা করেন। বনবিবি বোধহয় সুন্দরবনের নিজস্ব দেবী। মুন্সী বয়নুদিনের লেখা 'বনবিবি জহুরানামা' নামে একটি কাহিনী থেকে জানা যায় বনবিবি প্রবল বিক্রমশীল ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়কে যুদ্ধে পরাজিত করে সুন্দরবনের দেবী হিসাবে নিজেকে অধিষ্ঠাতা করেন।

জীবিকার সন্ধানে জঙ্গলে যাওয়া পুরুষদের মঙ্গলার্থে, নারীরা সমস্ত দিনের খাবার রাতেই তৈরি করে নেন। ওঁদের ধারণা দিনের বেলায় গৃহে আগুন জ্বালালে তাঁর স্বামীর বুকে চিতা জ্বালা হয়। দিনের বেলায় রং, সিঁদুর পরলে, আয়নাতে মুখ দেখলে, তেল-সাবান মাখলে বনবিবি রুষ্ট হবেন। ফলে তাঁর স্বামীকে বাঘে খাবে। এমন সব ভুরিভুরি কুসংস্কার মনের জমিতে কংক্রীটের মতো জমে গেছে। কোন নারী যদি এই সমস্ত নিয়ম লঙঘন করেন আর ঘটনাচক্রে তাঁর স্বামীকে যদি বাঘের উদরে যেতে হয়, তাহলে সেই নারীর জীবনে নেমে আসে গভীর অন্ধকার। স্বামীর মৃত্যুর জন্য সেই নারীকে দায়ী করা হয়। এই অপবাদ ঘোঁচাতে ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য অনেক সময় নারীকে আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নিতে হয়।

এবারে অরণ্যের গভীরে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দু'একটা দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে বলছি। অরণ্যে নামার পূর্বে বন্দ, জ্বালান, খিলান ইত্যাদি মন্ত্র পড়েন। ওঁদের ধারণা 'বন্দ' মন্ত্র পাঠ করলে অরণ্যের যে এলাকার মধ্যে ওঁরা কাজ করবেন, সেই এলাকার মধ্যে বাহিরে থেকে কোন বাঘ প্রবেশ করতে পারবে না। 'জ্বালান' মন্ত্রের জোরে বাঘের গায়ে এত জ্বালা ধরবে যে, ওই বন্ধ এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। ওঁদের আরো বিশ্বাস 'খিলান' মন্ত্র পড়লে, বাঘ তার দাঁতের দুটো পাটি এক করতে পারে না। — এই সব কুসংস্কার অন্ধ বিশ্বাসের শিকার হয়ে প্রতি বছর বহু মানুষকে অকালে বাঘের হাতে প্রাণ দিতে হচ্ছে। এমনকি সুন্দরবনে বিধবা পল্লীও গড়ে উঠেছে।

সুন্দরবনে এই সব নিজস্ব কুসংস্কার ছাড়াও বাঙলার অন্যান্য গ্রাম-গঞ্জে যে সমস্ত কুসংস্কার আছে, তা সুন্দরবনে অন্য চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে আ'ছে। যেমন মায়ের বুকে দুধ কম হলে, মনে করা হয় বুকের দুধ ভূতে খাচ্ছে। আবার দুধ বেশি হলে মনে করা হয় ভূতের দুধ বুকে ভর করেছে। ডাক পড়ে ওঝা গুণিনদের—চলে ঝাড়ান ফুঁক জড়িবুটি।

কুকুরে কামড়ালে পাকা-কলার মধ্যে জোনাকী পোকা কিংবা কেঁচো পুরে আক্রান্তকারীকে খাইয়ে জলাতঙ্ক রোগ সারানোর রেওয়াজ আজও সুন্দরবনে বিদ্যমান।

আজও সুন্দরবনে মহিলাদের ভূত ছাড়াতে গিয়ে ওঝা-গুণিনরা ঝাঁটা-জুতো দিয়ে মহিলাদেরকে প্রায় ধোলাই করে বসে। প্রয়োজনে অগ্নিবাণ মারে। ইত্যাদি কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, বুজরুকী, জরিবুটি এককথায় এই সমস্ত হাতুড়ে চিকিৎসার শিকার হয়ে সুন্দরবনের বহু মানুষকে অকালে প্রাণ দিতে হচ্ছে — হতে হচ্ছে আরও নানা জটিল রোগের শিকার।

সুন্দরবনে এই সমস্ত কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের মূলে যুগযুগ ধরে শিকড় গেড়ে বসে আছে, বিজ্ঞান চেতনার অভাব-অশিক্ষা, দারিদ্রতা, যোগাযোগের দুর্গমতা, প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অভাব — এই সমস্ত অভাবগুলি সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্তি ঘটাতে না পারলে, সুন্দরবন থেকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসকে সমূলে উৎপাটিত করা আদৌ সম্ভব নয়।

* 1নং দীঘিড় পাড়, ক্যানিং টাউন, 24 পরগণা (দঃ)

বাতাস যদি না থাকত

কমল চক্রবর্তী*

এক যে ছিল

না, — রাজা নয়, রাণীও নয়, — এক বেলুনওয়ালা। নাম তার ? জানি না। তবে ছোটরা তাকে বেলুনদাদা বলে ডাকে। সে প্রায়ই বিকেলে আসত। এসে দাঁড়াত ঐ পার্কের মধ্যে। খুব কাছে। দু'তিন মিনিটের পথ। আমরা মানে ছোটরা ছুটে যেতাম তার কাছে। 50 পয়সা বা 1 টাকা বা তার বেশি দাম দিয়ে বেলুন কিনতাম। অবশ্যই পছন্দমতো। লাল, নীল, সবুজ বা হলুদ। কখনও বা গ্যাস বেলুন কিনে আনতাম। কিন্তু গ্যাসবেলুন মাঝে মাঝে হাত ছেড়ে উড়ে চলে যেত। কোথায় যেত ? কেন যেত ? জানতে চেষ্টা করেছি কত। কিন্তু জানতে পারি নি। মনে হতো অন্য দেশে যেখানে আমাদের মতো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আছে তাদের কাছেই যেত। তাদের কাছে কিভাবে যেতে হয় জানি না। বড় হয়ে নিশ্চয়ই সেখানে যাবো। কারো বাধা শুনবো না।

শুনেছি, বেলুনে নাকি বায়ু থাকে। কিন্তু বায়ুর কথা তো কিছুই জানি না। জানতে বড় ইচ্ছে করে। অবশ্য ইচ্ছেটা একদিন পূরণ হল। পূরণ করলেন আমাদের সবজান্তা মামা। একদিন আমরা পাঁচজন তাঁকে ঘিরে ধরলাম। পাঁচজন মানে আমি (বাবা-মা আমাকে বুবান ডাকে) মামন, তুলি, সুস্পা আর বাবই। আমাদের আবদার মামা ঠেলে ফেলে দিলেন না। সাতদিন সময় নিলেন। আমরা অপেক্ষা করে রইলাম। তারপর পেলাম তার উত্তর। মামা তাঁর ডাইরীতে বায়ুর কথা লিখে আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তা পড়ে ফেললাম। কিন্তু বন্ধুদের তো ফাঁকি দিতে পারি না। তাই সে লেখা পড়ে শোনাচ্ছি।

বায়ু

গোড়ার কথা ঃ

আমরা মানে মানুষরা একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে ভালবাসি। তাইতো কেউ থাকি চীনে, কেউ জাপানে, কেউ রাশিয়ায়, কেউ বা স্পেনে। তবে ভারত বা অন্যদেশকেও বাদ দিচ্ছি না, তাই সে সব দেশেও। যে যেখানেই থাকি না কেন, আমরা সবাই ডুবে আছি। কিন্তু কিসে ? কেন ? — বায়ুতে।

এই বায়ু জিনিসটা আবার কি ? একে তো আমরা দেখতে পাই না। শুধু অনুভব করতে পারি। এটি হলো কয়েকটি গ্যাসের মিশ্রণ অর্থাৎ কয়েকটা গ্যাস মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। আর এর মধ্যেই আমরা ডুবে আছি। যে যে গ্যাস বায়ুর মধ্যে নিজেদের নাম লিখিয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান দুটি হলো নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন। বাকী গ্যাসগুলির কথা জানব কিছু পরে। বায়ুর উপাদান আলোচনার সময়।

বায়ুতে যে যে গ্যাস আছে, সেগুলির কারো কোন রঙ নেই। আর তাই তাদের মিলনে যে বায়ুর সৃষ্টি তারও কোন রঙ নেই। বায়ুর যে গ্যাসটির প্রয়োজন আমাদের সবচেয়ে বেশি, সেটি হলো অক্সিজেন। এর ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে সমস্ত জীবজগত। মানুষ, পশুপাখী, গাছ-পালা। প্রত্যেকেরই চাই অক্সিজেন। নইলে পৃথিবীতে প্রাণ আর থাকবে না, সবকিছুই মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়বে। গাছপালারা অবশ্য সবসময় অক্সিজেন নেয় না, নেয় অন্য একটি গ্যাস। নাম তার কার্বন-ডাই অক্সাইড। সূর্যের আলোয় সবুজ পাতায় চলে এক কাজ। সেই কাজে গাছের চাই কার্বন ডাই অক্সাইড। তাই গাছ তখন এই গ্যাসটি বায়ু থেকে নিয়ে নেয় আর বিনিময়ে ফিরিয়ে দেয় অক্সিজেন। আমরা তো অক্সিজেন চাই-ই, সুতরাং আমাদের উপকারই হয় তাতে। তাই পরিমাণের দিক দিয়ে বায়ুতে অক্সিজেনের স্থান দ্বিতীয় হলেও, গুরুত্বের মাপকাঠিতে গ্যাসটি প্রথম স্থান দখল করে নিয়েছে।

এখন আয়তনের বিচারে প্রথম স্থানটি যার দখলে সেটি কোন্ গ্যাস ? অবশ্যই নাইট্রোজেন। বায়ুতে এর পরিমাণ প্রায় 3.86×10^{18} কিলোগ্রাম। আমাদের প্রয়োজনীয় নানা জিনিসের মধ্যে গ্যাসটি লুকিয়ে থাকে। বায়ুতে নাইট্রোজেন যদি না থাকত, সবটাই অক্সিজেন থাকত, তবে সেই অক্সিজেন কি আমাদের বিশেষ সুবিধে দিত ? মোটেই না। বরং এত অক্সিজেনে শ্বাস প্রশ্বাস নিলে দেহের ভেতরের নানা ক্রিয়া তাড়াতাড়ি ঘটত আর তাতে আমরা খুবই অস্বস্তিবোধ করতাম। বায়ুতে নাইট্রোজেন থাকাতে এমনটি হবার উপায় নেই। তাই আমরা সহজভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারি। এছাড়া বায়ুতে অক্সিজেন একা থাকলে, আগুন নেভানোর কাজটাও খুব কঠিন হতো।

* B-25/4 Kalindi Housing Estate, Calcutta-89

বায়ুর দুটি গ্যাসের কথা আমরা জানলাম। কিন্তু এরা এলো কোথা থেকে ? আর তা জানার আগে জানতে হবে বায়ু এলো কোথা থেকে ?

বায়ুর জন্মকথা ঃ

পৃথিবীর যে বায়ুতে মানুষ সবসময় ডুবে থাকে তার জন্ম হলো কি ভাবে ? বায়ুর জন্ম নিয়ে নানাকথা নানা জল্পনা কল্পনা রয়েছে। পুরাণের কথা বলতে গেলে বলতে হয় পবনদেবের কথা। তিনি ছিলেন বায়ুর দেবতা। তিনি উত্তর পশ্চিম দিক বা বায়ুকোণের অধিপতি। এই দেবতার করুণাতেই নাকি প্রাণের অস্তিত্ব।

পুরাণ যাই বলুক না কেন, বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানীদের কথাই আমাদের শুনতে হবে। বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী সৌর পরিবারের একটি গ্রহ। আর সূর্য হচ্ছে সেই পরিবারের প্রধান। তার পরিচয় সে একটি নক্ষত্র। নক্ষত্র মানে কি ? নক্ষত্র হচ্ছে জ্বলন্ত গ্যাসের বিরাট আগুনের ডেলা। সবসময় দাউ দাউ করে জ্বলছে। এই জ্বলার মধ্যে এতটুকু সময় নেই বিশ্রাম নেবার। এর থেকে পাওয়া যাচ্ছে তাপ ও আলো। এই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে সূর্যের মত অসংখ্য নক্ষত্র বা তারা। সংখ্যাটা খুব কম নয়। কয়েক হাজার কোটি। পৃথিবী সৌর পরিবারের গ্রহ বলে, সূর্যের কথা তাকে মেনে চলতে হয়।আর তাই বুঝি সে সূর্যের চারদিকে অনবরত ঘুরছে। অবশ্য কিছু নিয়ম মেনে। সূর্যও কিন্তু চুপ করে বসে নেই। সেও আমাদের ছায়াপথকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে ছুটে চলেছে। এই ছায়াপথ আবার কি ? রাতের আকাশে তাকালে দেখা যায় ঝাঁকে ঝাঁকে নক্ষত্র। এরা অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে। একে নক্ষত্রবিদরা ছায়াপথ বলেন। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের ছোটাছুটিতে একসময় এক কাণ্ড হয়েছিল। তাতে বিরাট আকারের একটি নক্ষত্র সূর্যের কাছে চলে এসেছিল এবং সেই নক্ষত্রটি তার আকর্ষণ বলের সাহায্যে সূর্য থেকে খানিকটা অংশ বের করে নিয়েছিল। আর সেই ছিটকে আসা অংশ থেকেই নাকি গ্রহগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এ ধারণাটা ছিল একান্তই ভুল। আজকের বিজ্ঞানীরা অবশ্যই তাই বলেন।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য নক্ষত্র ছাড়া আছে ধুলোর বিরাট বিরাট স্তূপ আর নানা গ্যাস। সূর্য তার চলার পথে কোন একসময় এই ধুলো গ্যাসের স্তূপ থেকে কিছুটা নিজের দিকে টেনে এনেছিল। ধুলো-গ্যাসের সেই স্তূপ কয়েকলক্ষ বছর এলোমেলো পথে ঘুরে ঘুরে পরে নির্দিষ্ট পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে লাগল।

ধুলো-গ্যাসের মেঘ একইভাবে থাকতে পারল না। কারণ ধুলোর কণা কঠিন এবং ভারী আর গ্যাস হচ্ছে সে তুলনায় অনেক হালকা। তাই গ্যাসগুলো বাইরের দিকে রইল আর ভারী জিনিস ভেতরের দিকে ঢুকে পড়ল। এই গ্যাসের মধ্যে কঠিন কণাগুলো সব জড়ো হয়ে বড় বড় পিণ্ড বা শিলাখণ্ডের সৃষ্টি হলো। শিলাখণ্ডের বাইরের গ্যাসও ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে লাগল। সৃষ্টি হলো নানা গ্রহের। ধুলো-গ্যাস থেকে যে সব গ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে কোন্ কোন্ গ্যাস ছিল ? মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে সে সময় দেখা যায় যে হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামই ছিল প্রধান দুটি উপাদান। বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেছেন, পৃথিবীতে ঐ গ্যাসদুটির পরিমাণ অন্যান্য গ্রহের থেকে কম। যা আছে তা জল (H_2O) আর অসংখ্য জৈব পদার্থের মধ্যে। অবশ্য লুকানো অবস্থায়।

পৃথিবীর জন্মের সাথেই লুকিয়ে আছে বাতাসের জন্ম কাহিনী। পৃথিবীর শিলাখণ্ডের ভেতরে আছে নানা ধরনের মৌল বা মৌলিক পদার্থ। আর এই মৌলিক পদার্থ হচ্ছে এমন সব পদার্থ যা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করলে নতুন কোন পদার্থ *পাওয়া যায় না। তা যে ভাবেই ভাঙ্গা হোক না কেন। বিজ্ঞানীরা* প্রকৃতির ঝুলি পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছেন, সেখানে কতগুলি মৌল আছে। সংখ্যাটি 100 এর কাছাকাছি। এবং তা হলো 92। এইসব মৌলের মধ্যে কয়েকটি তেজস্ক্রিয়। তেজস্ক্রিয় আবার কি ? তেজস্ক্রিয় মৌল বলতে বোঝায় এমনসব মৌল যারা নিজে থেকেই আলফা, বিটা প্রভৃতি নামের রশ্মি ছেড়ে দিতে (বিকিরণ করতে) পারে। যখন আলফা, বিটা রশ্মি ত্যাগ করে তখন নতুন জিনিস তৈরী হয়। একে তেজস্ক্রিয় বিভাজন বলে। প্রত্যেক তেজস্ক্রিয় বিভাজনেই তাপ বেরিয়ে আসে। তাই পৃথিবীর ভেতরের তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এইসব রশ্মি বিকিরণ করে আসছে। আলফা রশ্মি বিকিরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে হিলিয়াম নামের গ্যাসটি। এছাড়া আর্গন নামে য়ে গ্যাসটি পাওয়া যায় তার সৃষ্টিও ঐ তেজস্ক্রিয়তার ফলে। পৃথিবীর জন্ম সময় থেকেই এই তেজস্ক্রিয়তা শুরু হয়েছিল এবং তাতে চলেছিল ভাঙ্গা গড়ার খেলা। সেই খেলাতে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে নানা গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প।

এইভাবে অনন্তকালের ভাঙাগড়ার খেলার মধ্যে দিয়ে পাওয়া গেছে বিভিন্ন গ্যাস। এবং তাদের মিলিত রূপই হচ্ছে বায়ু। বায়ুর মধ্যে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণ বিভিন্ন। এদেরকে আলাদা করে খুঁজে নেওয়াও সম্ভব হয়েছে এখন। জানা গেছে এদের স্বভাব চরিত্র।

বায়ুমণ্ডল ঃ

বায়ুর জন্মকথা আমরা সংক্ষেপে জানলাম। এখন প্রশ্ন — এ বায়ু কি উপরের দিকে লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ? না, এর অবস্থান উপরের দিকে মাত্র 150 মাইলের মতন। এই বায়ুর মোড়কের মধ্যে আমরা বাস করি এবং একেই আমরা বায়ুমণ্ডল বলি।

বায়ুমণ্ডলের আবার চাপ আছে। ফরাসী বিজ্ঞানী পাস্কাল প্রমাণ করেন যে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যত উচুঁতে ওঠা যায়, বায়ুমণ্ডলের চাপ তত কমে। তাই উচুঁ পাহাড়ে উঠলে বায়ু বা বায়ুর অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। তখন অক্সিজেন নিয়ে সেখানে যেতে হয়। অর্থাৎ উচুঁতে উঠলে হাঁপ ধরে যায়। কিন্তু মাটির কাছাকাছি এমনটি ঘটে না, কারণ সেখানে বায়ুচাপ ভালই থাকে। স্বাভাবিক বায়ুচাপে মানুষ সহজভাবে বাস করতে পারে। এই স্বাভাবিক বায়ুচাপটা আবার কি সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুচাপকে স্বাভাবিক বায়ুচাপ বলে। এখন সমুদ্রতীর ছেড়ে যদি আমরা কোন পাহাড়ী অঞ্চলে যেমন দার্জিলিং শহরে যাই তবে কি আমাদের শ্বাসকষ্ট হবে ? না। কারণ দার্জিলিং এর উচ্চতা প্রায় 7000 ফিট (2134 মিটার)। এই উচ্চতায় শ্বাসকষ্ট হবার কথা নয়। তবে যদি দার্জিলিং যা উচুঁ তার তিনগুণ উচুঁতে উঠি তবে শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। এই উচ্চতা মানে হাঁটা পথে প্রায় 4 মাইল। এত উপরে বায়ুচাপ যথেষ্ট কমে যায়। বায়ুচাপ কমা মানে বায়ুর অক্সিজেনের অভাব। যেখানে অক্সিজেনের অভাব, সেখানে শ্বাসকষ্ট হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে কি আমরা 4 মাইলের উপরে উঠি না ? উঠি। তবে অক্সিজেনকে সঙ্গে নিয়ে। আমরা প্লেনে চেপে বা বেলুনে করে প্রায় 10 থেকে 25 মাইল পর্যন্ত উচুঁতে উঠতে পারি। এর উপরে বায়ুর পরিমাণ এত কমে যায় যে বেলুন পর্যন্ত তাতে ভেসে থাকতে পারে না। এর উপরে আরও উচুঁতে যে বায়ু, সে বায়ুর স্বভাব একটু অন্য ধরনের। এখানে বায়ু আয়ন অবস্থায় থাকে। এই আয়ন অবস্থাটা আবার কি ? বায়ুতে যে সব গ্যাস থাকে সেই গ্যাসগুলি তৈরী হয় অসংখ্য ছোট ছোট কণা দিয়ে। যাদের আমরা অণু বলি। এই অণু খালিচোখে বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না। এই অণুগুলির মধ্যে আবার দুই বা তার বেশি ছোট ছোট কণা থাকে। এদেরকে পরমাণু বলে। এই পরমাণু যখন ভেঙ্গে যায় তখন তিন ধরনের কণার সৃষ্টি হয়। কণাগুলির নাম ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। সাধারণ হাইড্রোজেন ছাড়া অন্যসব পদার্থে এই তিন কণাই থাকে। নিউট্রন কণা সাধারণ হাইড্রোজেনকে এড়িয়ে চলে। তবে ভারী হাইড্রোজেনে কণাটি থাকে। সে সব কথা এখন আর আনছি না। এই তিন কণার তিন ধর্ম। ইলেকট্রন হচ্ছে অপরাধর্মী অর্থাৎ নেগেটিভ, প্রোটন হচ্ছে পরাধর্মী অর্থাৎ পজেটিভ আর নিউট্রন হচ্ছে তড়িৎহীন। অড়িৎহীন হলেও পরমাণুর গঠনে কণাটি দামী দামী কথা বলে। আর ইলেকট্রন যখন বায়ুর কোন গ্যাস বা অন্য কোন পরমাণুর সঙ্গে মেশে তখন তাকে তার অপরাধর্ম দান করে। এই দানের ফলেই আয়ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। একের বেশি পরমাণু থাকলেও ইলেকট্রন এইভাবে অপরাধর্ম দান করতে পারে। ইলেকট্রন বায়ুর গ্যাসকে আয়ন করলে, বায়ুর আয়ন মণ্ডল পাওয়া যায়। এই মণ্ডল বা স্তর থেকেই পৃথিবী থেকে পাঠানো ছোট ঢেউয়ের বেতারবার্তা আবার ঠিকরে পৃথিবীতে ফিরে আসে।

এই বায়ু মণ্ডল কিভাবে থাকে তা জানা দরকার। একে বোঝার জন্য কয়েকটি স্তরে বা মণ্ডলে ভাগ করা হয়। স্তরগুলির নাম ক্ষুব্ধমণ্ডল, শান্তমণ্ডল, ওজোনমণ্ডল ও আয়নমণ্ডল।

প্রথমেই যার নাম, সেটি হলো ক্ষুব্ধমণ্ডল। এই মণ্ডলে বায়ু স্তর মাটির গা ঘেঁষে উপর দিকে 15-18 কিলোমিটার পর্যন্ত নিজেকে বিছিয়ে রেখেছে। এ অঞ্চলের বায়ু সবসময়েই যেন ক্ষুব্ধ আর চঞ্চল। এখানের বায়ু ছুটে বেড়ায় আর তাই এই স্তরের বায়ুতে মেঘ, ধুলিকণা প্রভৃতির বাস। এজন্য এই স্তরে বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটে আর তাতে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি মাঝেমাঝেই দেখা যায়।

ক্ষুব্ধমণ্ডল ছাড়িয়ে কিছু উপরে উঠলেই বায়ুমণ্ডলের আরেকটি রূপের পরিচয় পাই। এখানে বায়ুর সেই দাপট নেই, নেই তার অস্থিরতা। সে যেন চঞ্চলরূপটি ঝেড়ে ফেলে এক শান্তশিষ্ট বালকের রূপ নিয়েছে। এই স্তরের উচ্চতা 60 থেকে 70 কি.মি.। কিন্তু এই শান্তরূপটি কি মানুষের কাছে আরামদায়ক ? মোটেই না, বরং কষ্টদায়ক। কারণ, এস্তরে বায়ুর ঘনত্ব কম অর্থাৎ বায়ুর অক্সিজেনের পরিমাণও কম। অক্সিজেন কম থাকায় ব্যাঘাত ঘটে শ্বাস-প্রশ্বাসের। শ্বাস প্রশ্বাসের কাজে ব্যাঘাত ঘটলেও তার শান্তরূপের জন্য এই অঞ্চলে ঝড়-বৃষ্টি বা বজ্রপাতের ঘটনা নেই বললেই চলে।

বায়ুর দুটি ধাপ অর্থাৎ ক্ষুব্ধমণ্ডল আর শান্তমণ্ডল পেরিয়ে আরও উপরে এলে পাওয়া যায় আর এক নতুন গ্যাসের স্তর। নাম ওজোনস্তর বা ওজোনস্ফিয়ার। এই স্তরে ওজোন নামে এক গ্যাস থাকে। গ্যাসটিকে অক্সিজেনের আত্মীয় বলা যেতে পারে। কারণ এই গ্যাসের প্রতি অণুতে তিনটে করে অক্সিজেন পরমাণু থাকে। আর অক্সিজেন অণুতে থাকে দুটি অক্সিজেন পরমাণু। এজন্য ওজোনকে অক্সিজেনের বহুরূপতার একটি বলা হয়। গ্যাসটি শান্ত মণ্ডলের মাথায় চেপে বসে থাকলেও, চুপচাপ বসে থাকে না। একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ সে করে যায়। কাজটি কি ? কাজটি হলো, সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মিকে নিচের দিকে অর্থাৎ মাটির কাছে সে ঘেঁষতে দেয় না। যদি গ্যাসটি একাজ না করত, তবে কি হতো ? তবে দেখা দিত আর এক বিপদ। বিপদটি কি ? বিপদ হচ্ছে অতিবেগুনি রশ্মি মাটিতে এসে পড়ত আর পড়ার আগে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির দেহে হুল ফুটিয়ে দিত।

অতিবেগুনির হলে চামড়ায় নানা রোগের সৃষ্টি হতো। সুতরাং এই রশ্মির হাত থেকে বাঁচতে গেলে চাই ওজোন গ্যাসটিকে। ওজোন সে কাজ ঠিকভাবে পালন করে যাচ্ছে। শুধু কি তাই ? গ্যাসটি অনেক পরিমাণ তাপও শুষে নিচ্ছে। সেজন্য কোন কারণে ওজোনের পরিমাণ কমে গেলে অতিবেগুনির দাপট বেড়ে যাবে। আর তার ফল ভোগ কতে হবে আমাদেরই। শুধু অতিবেগুনি রশ্মি কেন, ওজোন গ্যাসটিও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। আর তাই বুঝি প্রকৃতি নিজে থেকেই অতিবেগুনি ও ওজোনের লড়াই বাধিয়ে অবস্থা সামাল দিচ্ছে। কারো হার বা জিৎ নেই এই লড়াইয়ে। একে সাম্যাবস্থা বলে।

ওজোন মণ্ডল ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠলে যে মণ্ডল তার নাম আয়ন মণ্ডল। এখানে বায়ুর মধ্যেকার গ্যাসগুলি আয়ন অবস্থায় থাকে। আয়নস্তরের প্রধান দুটি গ্যাস হচ্ছে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। বেতার যোগাযোগের জন্য এই আয়নস্তরের প্রয়োজন। এই স্তর খুব ঠাণ্ডা। বায়ুর ঘনত্ব এখানে খুব কম। তাই এই ঠাণ্ডাকে সরিয়ে নেওয়ার মত কোন ব্যবস্থাও নেই। এই ঠাণ্ডা আয়নস্তর বা মণ্ডল ছাড়িয়ে ওপরে উঠলে আর কোন গ্যাসের খোঁজ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ আয়ন মণ্ডলের ওপরে আছে মহাশূন্য।

পৃথিবীর বিভিন্নস্তরের বায়ুমণ্ডলের কথা বলা হলো। এই বায়ুমণ্ডল তার নিজের চাদর দিয়ে দিনের বেলা সূর্যের তাপ অনেকটা ঠেকিয়ে রাখে। আর রাতের মহাশূন্যের ঠাণ্ডাকেও আসতে বাধা দেয়। পৃথিবীর এই বায়ুকে পৃথিবী টেনে ধরে রেখেছে। তাই বায়ুর পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। যে শক্তি বা বলের সাহায্যে পৃথিবী বায়ুকে ধরে রেখেছে তাকে অভিকর্ষ বল বলে। পৃথিবীর অভিকর্ষ বল বায়ুকে ধরে রাখলেও, চাঁদ কিন্তু ধরে রাখতে পারে নি। চাঁদের অভিকর্ষ বল কম হওয়ায় বায়ু সেখান থেকে চলে গেছে। তাই বায়ুহীন চাঁদের আবহাওয়া দিনের বেলা সূর্যের তাপে প্রচণ্ড গরম থাকে। আর একই কারণে রাতে সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে। শুধু কি তাই, বায়ু নেই বলে, সেখানে কোন শব্দ হলে সে শব্দ কাছাকাছি কোন মানুষ থাকলেও তার কানে এসে পৌঁছবে না। অর্থাৎ চাঁদের দেশ মানুষের কাছে এক শব্দহীন রাজ্য।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞপ্তি

1959 খৃস্টাব্দের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (কেন্দ্রীয়) রুলের 4 নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি ঃ—

1. যে স্থান থেকে প্রকাশিত হয় তার ঠিকানা ঃ— বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
2. প্রকাশনার কাল ঃ— মাসিক
3. মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা ঃ— শ্রীজগবন্ধু পাত্র, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
4. প্রকাশকের না, জাতি ও ঠিকানা ঃ— শ্রীজগবন্ধু পাত্র, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
5. সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা ঃ— শ্রীরতনমোহন খাঁ (সম্পাদনা সচিব) ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
6. স্বত্বাধিকারীর নাম, জাতি ও ঠিকানা ঃ— বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান) পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

আমি শ্রীজগবন্ধু পাত্র, ঘোষণা করিছি যে উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ ঃ 26.2.96

স্বাক্ষর ঃ শ্রীজগবন্ধু পাত্র
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে
প্রকাশক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা

শ্যাম্পু কতটা নিরাপদ ?

কমলকুমার সেনগুপ্ত*

পত্র পত্রিকা বা দূরদর্শনে চুল পড়া বন্ধ করা অথবা খুসকি নিবারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের "শ্যাম্পু"র বিজ্ঞাপন দেখা যায়। চুল সম্পর্কে পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমান দুর্বলতা। বিশেষতঃ চুল নারী সৌন্দর্য্যের এক বিশেষ আকর্ষণ। সেজন্য বর্তমানে "শ্যাম্পুর" ব্যবহার খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু কজন খবর রাখেন যে শ্যাম্পুর মধ্যে আছে সেই একই পরিষ্কারক কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ (Detergent) যা আমাদের দৈনন্দিন গৃহস্থালীর বাসনপত্র পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কৃত্রিম পরিষ্কারকের ব্যবহারে চুল পড়া বন্ধ তো হয়ই না বরং এতে চুলের প্রভূত ক্ষতি হয়। মালয়েশিয়ার পেসাং থেকে প্রকাশিত ক্রেতা সংগঠনের মুখপাত্র' Utuson Kon sumer' শ্যাম্পু সম্পর্কে যে সব তথ্য জানিয়েছে তা গভীরভাবে উদ্বেগজনক। তারা জানিয়েছে যে সাম্প্রতিক গবেষণায় শ্যাম্পুর মধ্যে একটি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থ 'নাইট্রোসেমিন' আবিষ্কৃত হয়েছে যা "NDELA" নামে পরিচিত। এই বিষাক্ত পদার্থটি মস্তিষ্কের আবরণীর কোমল চামড়া ভেদ করে মূল রক্ত স্রোতে মিশে যায়। ফলে চুল পড়া শুরু হয়। এর প্রভাবে মস্তিষ্কের চামড়ার রক্ষাকারী তৈলাক্ত স্তর চিড় খেয়ে হয়ে উঠে শুষ্ক ও অমসৃণ। জাপানের কিছু বিজ্ঞানী ইঁদুরের পশ্চাত দিকের লোম কামিয়ে কয়েকদিন সেখানে কৃত্রিম পরিষ্কারক প্রয়োগ করে দেখেছেন যে সেই জায়গার চামড়া ফুলে উঠেছে এবং সেখানে নতুন করে লোম গজায়নি। আরও উদ্বেগজনক তথ্য জানিয়েছেন জাপানের মাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসার মিকি মিমামি। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে কৃত্রিম পরিষ্কারক জন্মগত বিকৃতির সৃষ্টি করে। পোয়াতি ইঁদুরের পিছনের লোম ছেটে সেখানে তিনদিন যাবৎ কৃত্রিম পরিষ্কারক প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে শতকরা প্রায় 90 ভাগ ক্ষেত্রে ভ্রুণের মেরুদণ্ডের বিকৃতি ঘটেছে যার ফলে পরবর্তীকালে ইঁদুর ছানার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি হয়েছে।

এই NDELA বা 'নাইট্রোসেমিন' কিন্তু সরাসরী শ্যাম্পুতে দেওয়া হয় না। শ্যাম্পুর উপাদানে ব্যবহৃত দুটি এ্যামিন, ট্রাই ইথানলেমিন বা TEA অথবা ডাই ইথানলেমিন DEA কোন নাইট্রোসেটিং এজেন্ট যথা সোডিয়াম নাইট্রাইটের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এই NDELA তৈরী হয়। এই বিক্রিয়া শরীরের ভিতরে বা বাইরে যে কোন অংশেই হতে পারে। NDELA-র এই কলুষিতকরণ খুবই মারাত্মক কারণ TEA বা DEA চামড়ার মধ্য দিয়ে মূল রক্তস্রোতে মেশে। খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে যাবার দরকার হয় না। আর একটি সম্ভাব্য ক্যানসারের যোগসূত্র হল শ্যাম্পুর সংরক্ষক (Peservative) পদার্থ BNPD (2-ব্রোমো নাইট্রোপ্রপেন-1,3 ডাইঅল) নামক রাসায়নিক যৌগ। BNPD নিজে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী নয়, কিন্তু বিশ্লিষ্ট হয়ে নাইট্রাইট ও ফরমালডিহাইডে পরিণত হয়। এই নাইট্রাইট, ফরমালডিহাইড ও শ্যাম্পুর মধ্যে যে কোন এ্যামিন পুনরায় যুক্ত হয়ে শ্যাম্পুর মধ্যে নাইট্রোসেমিন তৈরি করে যা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী হিসাবে চিহ্নিত। শাম্পুর আরও কয়েকটি ক্ষতিকারক প্রভাবের কথা অবশ্যই উল্লেখ্য। যথা চক্ষুর প্রদাহ বা চামড়ার ক্ষতি। শাম্পুর উপাদানে ব্যবহৃত যে কেন একটি রাসায়নিক পদার্থ সারফ্যাকটান্টস্ কৃত্রিম সুগন্ধি, সংরক্ষক পদার্থ অথবা কন্ডিশনার যে কোন একটি এ্যালার্জিক বা সরাসরি চামড়ার প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। শাম্পু ব্যবহারকারীদের চোখ জ্বালা করা যদিও একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু কোন কোন শাম্পুর ব্যবহারে চোখে অস্বাভাবিক যন্ত্রণাদায়ক ফোলা বা কনজিটিভাইটিস ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সময় বিশেষে দৃষ্টিশক্তিরও ক্ষতি করে, বা অক্ষি গোলকের অসরতার সৃষ্টি হয়। শাম্পুর উপাদানের মধ্যে ফরমালডিহাইড বা কোয়ার্টার নিয়াম-15 চক্ষু প্রদাহ সৃষ্টিকারী। ফরমালডিহাইড ক্যান্সার সৃষ্টিকারী হিসাবেও চিহ্নিত। আসলে শাম্পু মূলত কৃত্রিম পরিষ্কারক জল, সুগন্ধি, তেল এলোভেরা সিল্কি প্রোটিন ইত্যাদির মিশ্রণ। এগুলি বিজ্ঞাপনের চমক হিসাবে যতটা আকর্ষণীয় আসলে ততটা কার্য্যকরী নয়। বিজ্ঞাপনে শুষ্ক তৈলাক্ত বা স্বাভাবিক চুলের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাম্পু ব্যবহারের প্রচার করা হয়। আসলে কিন্তু এই রকমারী শাম্পুর উপাদানে হেরফের হয় কেবল মাত্র কৃত্রিম পরিষ্কারকের মাত্রার উপর।

চুলের খুসকি নিবারণের জন্য যে ঔষধি শাম্পু চালু আছে তার উপাদানে জীবাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ থাকে। বর্তমানে "হার্বাল" শাম্পু বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এসব শাম্পুর বুকে ফুল ও ফল ও সুদৃশ্য প্যাকিং এর যতই আবেদন থাকুক আসলে এদের কার্যকারিতা কৃত্রিম শাম্পু অপেক্ষা বেশি ফলপ্রসু কিনা তাও প্রমাণ সাপেক্ষ। "এ্যাগ শাম্পু", বিজ্ঞাপনের আর এক চমক। এই শাম্পু দীর্ঘস্থায়ী ফেনার সৃষ্টি করে। ফেনার পরিমাণের উপর চুল পরিষ্কারের সম্পর্ক কতখানি তাও প্রমাণ হয়নি।

কলপ, ব্লিচিং বা চুল কোঁকড়া করা অথবা সোজা করার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বা তাপ প্রয়োগে চুলের যে ক্ষতি হয় শাম্পু কন্ডিশনার (ফ্যাটি বা এ্যান্টিষ্টাটিক) গুলি সে ক্ষতি ঢাকতে পারেনা। শাম্পু চুলের গোড়া শক্ত করতে অথবা শুষ্ক বা তৈলাক্ত কোনটাই করতে পারে না।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ব্যক্তি বিশেষের চুলের স্বাস্থ্য বা অবস্থা পরিষ্কারক দ্রব্যের উপর নির্ণীত হয়না, তা নির্ভর করে বংশগতি (heredity), বয়স ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর।

* ব্লক একস্, ফ্ল্যাট নং-4, বেল-ভিলা, কলিকাতা-700 037

গিরগিটি

ইন্দ্রনীল সান্যাল*

জুরাসিক পার্কের সেইসব ভয়াবহ ডাইনোসরদের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে ? গা ছমছম করা টিরানোসরাস রেক্স বা স্টেগোসরাসদের কথা বলছি। আর সম্প্রতি কলকাতায় হয়ে যাওয়া Dinosors Alive প্রদর্শনীতে তাদের তর্জন গর্জন অনেকেই হয়তো শুনেছেন। বেশ কয়েক কোটি বছর এরা পৃথিবীর বুকে দাপিয়ে বেড়িয়েছিলো। তারপর, আজ থেকে প্রায় 6 কোটি 50 লক্ষ বছর আগে এরা হঠাৎই হারিয়ে গেলো। কী করে, কেন, এদের বিলুপ্তি হল সে সব অনেক কথা। আমরা তার মধ্যে যাচ্ছি না। তবে হারিয়ে গেলেও এরা রেখে গেল এদের ক্ষুদে বংশধরদের যারা এখনও আমাদের ঘরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, আমি বলছি আমাদের অতিপরিচিত সরীসৃপ টিকটিকি, গিরগিটি, বহুরূপী, গোসাপ অথবা নাম শোনা কিন্তু চোখে না দেখা ড্রাকো, ইওয়ানা বা কোমোডো ড্রাগনদের কথা। ডাইনোসরদের সাথে এদের চেহারার আশ্চর্য্য মিল রয়েছে, ঠিক যেন একএকটি ক্ষুদে ডাইনোসর। আজ এদের কথাই বলব।

বাংলায় যাকে আমরা গিরগিটি বা রক্তচোষা বলি, তার বৈজ্ঞানিক নাম Colotes versicolor। এরা সাধারণতঃ বাগানে, ঝোপেঝাড়ে ঘুরে বেড়ায় বলে ইংরাজীতে এদের বলা হয় garden lizard। প্রধানতঃ ভারত চীন এবং মালয় উপদ্বীপে এদের দেখা যায়। ভারতে এই প্রজাতির যে গিরগিটিদের দেখা যায় তাদের গায়ের রং সাধারণতঃ মাটি রং ও শ্যাওলা সবুজের মিশ্রণ, রেগে গেলে এদের গলা ও মাথার দিকটা লাল হয়ে ওঠে। তাই ভুল করে অনেকে মনে করেন এরা রক্ত চুষে খায়। মানুষ বা কোনও প্রাণীর রক্ত এরা চুষে খায়না। সাধারণতঃ পোকামাকড় খেয়েই এরা বেঁচে থাকে। একটি প্রাপ্তবয়স্ক গিরগিটির দৈর্ঘ্য প্রায় 10 ইঞ্চির মত হয়। এদের গায়ে ছোট ছোট কাঁটার মত আঁশ থাকে। রাতের বেলায় এরা গাছের ওপর থাকাই নিরাপদ মনে করে।

আমাদের দেশে যে সব গিরগিটি দেখা যায়, তার মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল বহুরূপী বা Chameleon। এরা এত অদ্ভুতভাবে গায়ের রং পাল্টাতে পারে যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। এই প্রাণীটির অনেকগুলি প্রজাতি মাদাগাস্কার (মালাগাসি), আফ্রিকার মূল ভূখণ্ড ও ইউরোপে পাওয়া যায়। একটি প্রজাতি Chameleon calcaratus দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলংকায় পাওয়া যায়। অন্য একটি প্রজাতি Chameleon vulgaris পাওয়া যায় উড়িষ্যায়। উড়িষ্যার ঢেনকানলের জঙ্গলে আমি যে সব বহুরূপী দেখেছি তাদের গায়ের রং গাছের কচি পাতার মত সবুজ হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সেই সবুজের মধ্যে কালো ডোরাকাটা দেখা দেয়। আবার কখনও এরা গায়ের রং বদলে কালচে করে ফেলে।

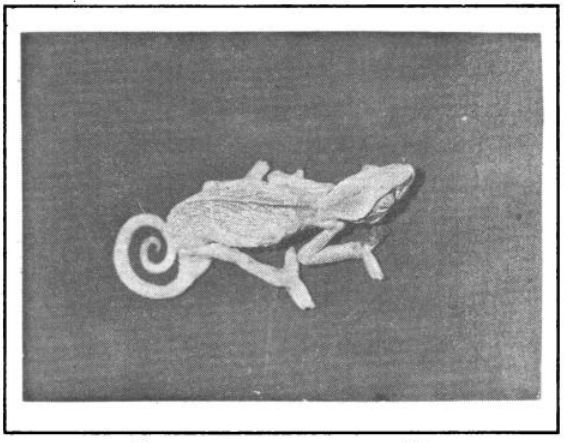

চিত্র-4 ঃ Chamoeleon বা বহুরূপী

এদের এই রং পরিবর্তন এদের কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণ গিরগিটির ক্ষেত্রে অবশ্য এই রং পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে এক ধরনের হর্মোন। বহুরূপীর সবকটি বৈশিষ্ট্যই অদ্ভুত। এরা দুটি অক্ষিগোলক আলাদাভাবে নড়াচড়া করাতে পারে। অর্থাৎ, দুটি চোখ দিয়ে এরা আলাদা আলাদা দৃশ্য দেখতে পায়। স্বভাবতঃই, সে দৃশ্য হয় দ্বিমাত্রিক। কেবলমাত্র শিকার ধরার সময় এরা দুটি চোখ দিয়ে একসঙ্গে দেখে। তখন দৃশ্য হয় ত্রিমাত্রিক। এটা মূলতঃ শিকার কতটা দূরে আছে তা বুঝতে সাহায্য করে। এরা পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের শিকার ধরাটা অনেকটা ব্যাঙের মত। লম্বা আঠালো জিভ মুখের ভিতর গোটানো থাকে। শিকারকে দেখতে পেলে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জিভ ছুঁড়ে তাকে ধরে ফেলে। এদের মাথা দেখলে মনে হয় যেন শিরস্ত্রাণ পরে আছে। গায়ে ছোট ছোট দানাদার আঁশ থাকে। এরা সাধারণতঃ গাছেই থাকে। গাছে চড়ার জন্য এদের হাত ও পায়ের অদ্ভুত অভিযোজন হয়েছে। আমরা এখানে একটা ছবি ছেপে দিলাম। ছবি থেকে এই অভিযোজন পরিষ্কার বোঝা যাবে। এদের হাত ও পায়ের

* ঢেনকানল বিজ্ঞান কেন্দ্র (জাতীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ) ভারত সরকার ঃ ঢেনকানল 759 001, উড়িষ্যা।

গঠন এমনই যে এরা সহজেই গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতে পারে।

আরেক ধরণের গিরগিটি আমাদের দেশে পাওয়া যায় — যাদের ইংরাজী নাম Mabuia। উড়িষ্যায় এরা "চেঁপিনেলী" নামে পরিচিত। দেখতে অনেকটা টিকটিকির মতই, তবে শরীরের রং মেটে বাদামী। তার ওপরে চকচকে সোনালী আঁশ থাকে। শরীরের দুপাশে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত লালচে বা হলদেটে টানা দানা থাকে। এরা ঝোপ জঙ্গলেই থাকে এবং খুব দ্রুত চলাফেরা করতে পারে।

আমাদের অতি পরিচিত গোসাপ বা Varanus ও প্রকৃতপক্ষে একধরনের গিরগিটি। ইরাজীতে এদের monitor lizard বলা হয়। গোসাপ এক অতি আদিম প্রজাতির গিরগিটি। আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এদের অনেকগুলো প্রজাতি দেখা যায়। ভারতীয় গোসাপ প্রায়

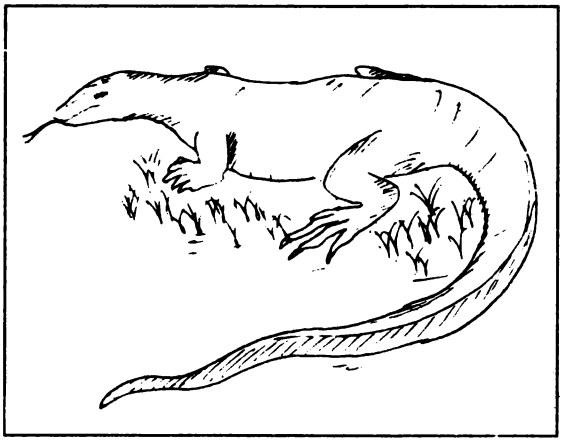

চিত্র নং 1 ঃ Varanus বা গোসাপ

2 ফুট মত লম্বা। গায়ের রং বাদামী, তার ওপর সারি সারি কালচে ছোপ থাকে। এদের লেজ চেপ্টা আর গলা লম্বা। শরীরে দানা দানা আঁশ থাকে। এদের জিভ লম্বা, মাঝখান দিয়ে চেরা এবং লক্‌লক্‌ করতে থাকে। এজন্যই এদেরকে ভুল করে সাপ মনে করা হয়। আসলে জিভ এদের স্পর্শেন্দ্রিয়, পরিবেশ বোঝার জন্যই এরা মাঝে মাঝে জিভ বাইরে নিয়ে আসে। এরা ঝোপজঙ্গল এবং গাছের ওপর বাস করলেও, ডিম পাড়ার সময়ে মাটিতে গর্ত করে ডিম পাড়ে। পোকামাকড় এবং ছোটখাটো প্রাণী এদের খাদ্য।

আফ্রিকায় নীল নদের উপত্যকায় প্রায় 6 ফুট লম্বা একরকম গোসাপ পাওয়া যায়। এরা কুমীরের বাচ্চা ধরে খায়। আবার প্রাপ্তবয়স্ক কুমীর কাছে এসে পড়লে মুখ দিয়ে এক বিশেষ ধরনের শব্দ করে সকলকে সাবধান করে দেয়। তবে সবচেয়ে ভয়ংকর গোসাপ পাওয়া যায় ইন্দোনেশিয়ার কোমোডো দ্বীপের জঙ্গলে। প্রায় 12 ফুট লম্বা কোমোডো ড্রাগন বা Varanus Komodensis ওজনে প্রায় 40-80 কি.গ্রা. মত হয়। এরা হিংস্র, মানুষ বা অন্য কোনও প্রাণীকে দেখলেই আক্রমণ করে। কোমোডো ড্রাগনদের নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প শোনা যায়।

ভারী অদ্ভুত আরেকটি গিরগিটি হল ড্রাকো। এরা উড়ন্ত ড্রাগন বা উড়ন্ত গিরগিটি নামেও পরিচিত। স্কুলপাঠ্য জীবন-বিজ্ঞানের বইতে এদের ছবিও অনেকে দেখে থাকবেন। নামে উড়ন্ত গিরগিটি হলেও এরা প্রকৃতপক্ষে উড়তে পারে না। এদের সামনের ও পেছনের পায়ের মাঝখানে বুকের দুপাশে পাঁচ ছটি পাঁজরের হাড় প্রসারিত হয়ে থাকে। সেই হাড়গুলো আবার পাতলা চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে বেড়ানোর সময়ে এই পাতার মত (আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে তালপাতার পাখার মত) ছড়ানো অংশটি প্যারাশ্যুটের ছাতার মত কাজ করে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে আদতে এদের দেহ এরকম ছিলো না। এই ডানা বা wing (যদিও এটা নড়াচড়া করা বা ঝাপটানো যায়না) আসলে একটা অভিযোজন। ড্রাকো সাধারণতঃ গাছে থাকে। এদের গায়ের রং রঙবেরঙের হয় ; যে গাছে এরা থাকে সেই গাছের ফুলের মত এদের রং হয়। এটাও একটা অভিযোজন। ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় এদের দেখা যায়। সুমাত্রা, জাভা ও বোর্ণিও দ্বীপে এদের এক প্রজাতি Draca Volans পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে যে প্রজাতিটি পাওয়া যায় তার নাম Draco dussumieri।

প্রাণীজগতের খোঁজ যারা রাখেন, তারা হয়তো জানেন যে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল এবং উত্তর আমেরিকার মরুভূমি অঞ্চল বহু অদ্ভুত ও প্রাচীন প্রাণীর আবাসস্থল। প্রাচীন অর্থে সেইসব প্রাণী যারা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু আমেরিকা মহাদেশে এখনো টিকে আছে। হয়তো পশ্চিম গোলার্ধে মানুষের বসতি অনেক পরে স্থাপিত হয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এখন আমরা পশ্চিম গোলার্ধের কিছু অদ্ভুত গিরগিটির কথা শুনব।

দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে পাওয়া যায় বিখ্যাত গিরগিটি ইগুয়ানা (Iguana)। বিখ্যাত বলছি এজন্য যে এদের সুবিশাল আকারের জন্য এরা গিরগিটি জাতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এদের দৈর্ঘ্য হয় সাধারণত 6 ফুটের মত। গোসাপ ছাড়া এতবড় গিরগিটি আর দেখা যা না। এদের দেহ চাপা, লেজ লম্বা এবং শরীরের ওপরের দিকে সারি সারি কাঁটা থাকে। এরা কিন্তু সর্বভুক্, আমিষ, নিরামিষ সবরকমই খেয়ে থাকে।

ইকুয়েডরের মূল ভূখণ্ড থেকে কিন্তু দূরে গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে (ডারউইনের অভিযানের কথা স্মরণ করুন !) পৃথিবীর একমাত্র সামুদ্রিক গিরগিটি অ্যাম্বলিরিংকাস (amblyrhyncus) পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্যে এরা ইগুয়ানার নিকট জ্ঞাতি। তবে সামুদ্রিক জীব হলেও অনেকসময়ে এদের

সমুদ্রতটে রোদ পোহাতে এবং ছোটখাটো আগাছা খেতে দেখা যায়।

ফ্রিনোসোমা (Phrynosoma) বা শিংওয়ালা ব্যাং. মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গিরগিটি। নামে ব্যাং হলেও আসলে এরা গিরগিটি। এরা দৈর্ঘ্যে 5 ইঞ্চি মত হয়, সারা শরীর ছোট

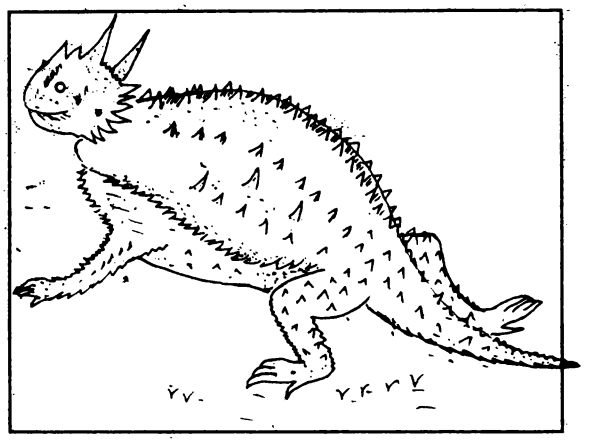

চিত্র 2 ঃ Phrynosoma বা শিংওয়ালা ব্যাং

ছোট কাঁটায় ঢাকা থাকে। মাথার দুপাশে পাঁচটি করে মোট দশটি বড় কাঁটা থাকে (যাকে ভুল করে শিং বলা হয়)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অংশই এদের প্রধান বাসভূমি। এদের মূল প্রজাতি phrynosoma cornutum ইলিনয় থেকে কানসাস এবং টেক্সাস থেকে উত্তর মেক্সিকো – এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায়।

পশ্চিম গোলার্ধের গিরগিটিদের কথা বলতে গেলে বিশেষ করে হেলোডার্মার (heloderma) কথা বলতে হয়। কারণ সমগ্র গিরগিটিকূলে এরাই একমাত্র বিষাক্ত গিরগিটি।

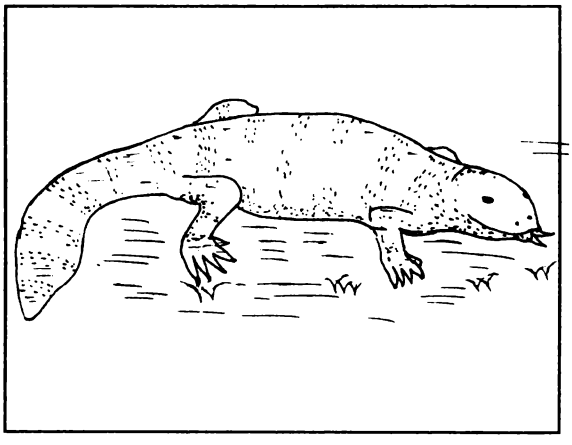

চিত্র-3 ঃ Heloderma বা দানাদার গিরগিটি

এদের বিষ Neurotoxic অর্থাৎ এদের কামড়ে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর নার্ভতন্ত্র নষ্ট হয়ে পক্ষাঘাত হয়ে যায়। এরা গিলা দৈত্য (Gila monster) নামেও পরিচিত। লম্বায় এরা প্রায় 2 ফুট মত হয়। শরীরের গঠন শক্ত সামর্থ। লেজ ছোট ও মোটা। মোটা লেজে এরা অতিরিক্ত চর্বি জমা করে রাখে। শরীরের রং বাদামী, তার মধ্যে কালো ও কমলা ডোরাকাটা দেখা যায়। গায়ে দানাদার আঁশ থাকে। তাই অনেক সময়ে এদের দানাদার গিরগিটিও (beaded lizard) বলা হয়। এদের খাদ্যাভাস খানিকটা অদ্ভুত। এরা অন্যান্য ছোটখাটো প্রাণীর ডিম খেয়ে বেঁচে থাকে। এই অভ্যাস প্রাচীন কালের ডাইনোসর Oviraptor এর কথা মনে করিয়ে দেয়। হেলোডার্মা নিজে ডিম পাড়ে বেলেমাটিতে গর্ত করে। এদের দুটি প্রজাতি Heloderma suspectum এবং Heloderma Horridum মেক্সিকো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনার মরুভূমিতে পাওয়া যায়।

আমাদের এই প্রবন্ধ শেষ করার আগে আরেকটি ভারী আশ্চর্য্যরকম গিরগিটির কথা বলি। হঠাৎ দেখলে এদের সাপ ছাড়া অন্য কিছু মনে হবেনা। এদের ইংরাজী নাম Ophisanrus. চলতি কথায় কাঁচ সাপ (Glass Snake) বলা হয়। আসলে এক বিশেষ ধরনের অভিব্যক্তির ফলে এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (হাত ও পা) প্রায় লোপ পেয়েছে। শরীর লম্বা ও সাপের মত প্যাঁচালো হয়। তবে এরা বিষাক্ত নয় — সাধারণতঃ শামুক, ইঁদুরের বাচ্চা, ছোটোখাটো পোকামাকড় খেয়েই এরা বেঁচে থাকে। এদের প্রধান বাসস্থান উত্তর আমেরিকা হলেও দক্ষিণ রাশিয়া, তুরস্ক ও মরোক্কোতে এদের দেখা যায়। এদের একটি প্রজাতি Ophisaurus gracilis পূর্ব হিমালয় ও মায়ানমারে পাওয়া যায়। (বর্তমান লেখক উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে এই জাতের গিরগিটির কথা শুনেছেন)।

পরিশেষে বলি, আমাদের অতি পরিচিত টিকটিকি বা Wall lizard ও এক বিশেষ ধরনের গিরগিটি। তবে এদের সম্পর্কে আলাদা করে আর কিছু বলব না। এছাড়াও আরও বহু ধরনের গিরগিটি আমাদের দেশেই আছে।

আরও একটা কথা — যারা গিরগিটি পর্যবেক্ষণ করতে চান তাদের উদ্দেশ্যে। সরীসৃপদের মধ্যে কারা কারা গিরগিটি পদবাহ্য তা কখনোই বাহ্যিক আকৃতি দেখে ঠিক করা উচিত নয়। গিরগিটিদের অস্থিতন্ত্রের (Skeleton) কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। তাছাড়া এদের বৃক্কের গঠনও আলাদা। এরা জল না খেয়ে অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে। উভচর সালামাণ্ডার বা কুমীরের সাথে গিরগিটিদের আকৃতিগত মিল থাকলেও এরা গিরগিটি নয়।

দূষিত জল পরিশোধনে অবায়বীয় পদ্ধতি

অর্ণবকুমার দে*

দূষিত জল পরিশোধনে জৈব পদ্ধতি (Biological Process) সর্বাধিক প্রচলিত। জৈব পদ্ধতি দুই প্রকারের — বায়বীয় পদ্ধতি (Aerobic Process) এবং অবায়বীয় পদ্ধতি (Anaerobic Process)। বায়বীয় পদ্ধতিতে দূষিত জৈব পদার্থ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয়ে নূতন কোষ সৃষ্টি হয় ও কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। অবায়বীয় পদ্ধতিতে জৈব পদার্থগুলি বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া. দ্বারা বিয়োজিত হয়ে মিথেন (Methane) ও কার্বনডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। মিথেন ও কার্বনডাইঅক্সাইডের মিশ্রণকে বলা হয় জৈব গ্যাস (Bio-gas)। অর্থাৎ অবায়বীয় পদ্ধতি থেকে শক্তি জৈবগ্যাস হিসাবে পাওয়া সম্ভব।

অবায়বীয় পদ্ধতি বায়বীয় পদ্ধতি অপেক্ষা বেশি সুবিধাজনক — কারণ (i) এই পদ্ধতিতে শক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে যা বায়বীয় পদ্ধতিতে হয় না। বায়বীয় পদ্ধতি চালানোর জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। অবায়বীয় পদ্ধতিতে উৎপন্ন শক্তি পদ্ধতিটি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অপেক্ষা সাধারণত অধিক। (ii) এই পদ্ধতিতে অত্যধিক দূষিত জলকে পরিশোধন করা সম্ভব। (iii) এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন বর্জ্য কঠিন পদার্থ (Sludge) এর পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। (iv) সম্পূর্ণভাবে আবৃত থাকার ফলে এই পদ্ধতি থেকে কোনো দুর্গন্ধ পাওয়া যায়না।

অবায়বীয় পদ্ধতিতে দূষিত জৈব পদার্থ থেকে জৈব গ্যাস (মিথেন ও কার্বনডাইঅক্সাইড) উৎপন্ন হওয়াতে তিন শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রথম শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়াকে acidogenic bacteria বলে। এরা জটিল জৈব অণুকে বিয়োজিত করে জৈব অ্যাসিড, অ্যালকোহল, শর্করা, হাইড্রোজেন ও কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়াকে বলে acetogenic bacteria — এরা প্রথম ধাপে উৎপন্ন পদার্থগুলি থেকে হাইড্রোজেন, অ্যাসিটেট ও কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়াদের বলা হয় methanogenic bacteria। এই ব্যাকটেরিয়া শেষ ধাপে অ্যাসেটিক অ্যাসিড, কার্বনডাই-অক্সাইড ও হাইড্রোজেন থেকে মিথেন গ্যাস (Methane) উৎপন্ন করে।

অ্যাসিডোজেনিক ব্যাকটেরিয়া দূষিত জলের জৈব পদার্থগুলিকে জৈব অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড-এ পরিণত করে — যথা ঃ— $C_6H_{12}O_6 + 2H_2O = 2CH_3COOH + 2CO_2 + 4H_2$

মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া শেষ ধাপে মিথেন উৎপন্ন করে। এই ব্যাকটেরিয়া দুই প্রকারের — (i) acetotrophic bacteria ও (ii) hydrogenotrophic bacteria.

অ্যাসিটোট্রোলিক ব্যাকটেরিয়া অ্যাসিটেটকে মিথেনে পরিণত করে ঃ—

$3CH_3COOH = 3CH_4 + 3CO_2$

হাইড্রোজেনোট্রোপিক ব্যাকটেরিয়া হাইড্রোজেনকে মিথেনে পরিণত করে ঃ—

$CO_2 + 4H_2 = CH_4 + 2H_2O$

অবায়বীয় পদ্ধতি চালনা করতে হলে প্রয়োজনে উপযুক্ত অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি। অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি নির্ভর করে পুষ্টিকর খাদ্য, উষ্ণতাও pH এর উপর। নতুন কোষবৃদ্ধি করতে হলে প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্যের সরবরাহ। নাইট্রোজেন ও ফসফরাস — এ দুটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। নাইট্রোজেনকে সাধারণত অ্যামোনিয়াম লবণ হিসাবে ও ফসফরাসকে সাধারণত ফসফেট লবণ হিসাবে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি ধাতু — যেমন – আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল, জিংক, মলিবডেনাম-এর খুব অল্প মাত্রায় প্রয়োজন। উষ্ণতার উপরও ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি নির্ভর করে। অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়া $40–70^{O}C$ উষ্ণতায় বেঁচে থাকতে পারে। সবথেকে অনুকূল উষ্ণতা $55^{O}C$ অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে জলের pH 6.5 – 7.5 উপযোগী। সব থেকে ভাল ফল পাওয়া গেছে pH 7.5 এ। সঠিক pH বজায় রাখার জন্য সোডিয়াম বাই কার্বনেট বা চুন ব্যবহৃত হয়। অবায়বীয় পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কলকারখানার দূষিত জল বর্তমানে অনেক দেশে পরিশোধন করা হচ্ছে। জল পরিশোধনের জন্য জলাধারের মতো আকৃতি নির্মাণ করা হয়, একে বলা হয় 'অবায়বীয় রিয়্যাক্টার' (Anaerobic reactor)। রিয়্যাক্টারের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া রেখে তার মধ্যে দূষিত জল পাঠানো হয়। জল পরিশোধিত হয়ে রিয়্যাক্টার থেকে নির্গত হয়।

বিভিন্ন করকারখানা যেমন – সুরাপ্রস্তুত শিল্প, ঔষুধ শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, কাগজ মিল ইত্যাদি তাদের বর্জ্য দূষিত জল এই পদ্ধতির দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে পরিশোধন করছে। আমাদের দেশে পদ্ধতিটি নতুন। কয়েকটি সুরা প্রস্তুত শিল্প ও কাগজমিল এই পদ্ধতির সাহায্যে তাদের দূষিত জল পরিশোধন করছে। কানপুরে বাড়ী থেকে নির্গত নর্দমার জল পরিশোধনে এই পদ্ধতিকে চালু করা হয়েছে 1989 এ এবং এটি সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে এইরকম আরেকটি পরিশোধন ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই।

আমাদের দেশে অধিকাংশ কলকারখানায় বর্জ্য দূষিত জল পরিশোধিনের কোন ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে সরকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনকে ক্রমশঃ কঠোর করছেন। অবায়বীয় পদ্ধতি গ্রহণ করলে অধিকাংশ কলকারখানাই তাদের দূষিত জল পরিশোধন করতে অবশ্যই সফল হবে।

* রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী

কালবৈশাখীর ঝড়

সত্যজিৎ শংকর সিংহ*

আবহ-তত্ত্ববিদ্‌দের ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের ফরাক্কার কাছে পদ্মানদীর দক্ষিণ তীর হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত অঞ্চলের নাম হল গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ। এই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কলিকাতা-সহ দক্ষিণ-24 পরগণা, উত্তর 24-পরগণা, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী—এই দশটি জেলা অবস্থিত। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—এই দুই গ্রীষ্মের মাসে একটি বিশেষ ধরনের বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়জলের প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গায় ঘটে থাকে। ঝড়ই এই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের প্রধান অঙ্গ। বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের যে কোন দিনে এই দুর্য্যোগ দেখা দেয়। একারণেই এই ঝড়ের নাম বৈশাখীর ঝড়। বৈশাখীর ঝড় কথা দুটির আগে 'কাল' কথাটিকে বসান হয়েছে—কাল অর্থে ভয়ংকর। এই ঝড়টির বৈশিষ্ট্য হল এই দুর্য্যোগটি শুধু অপরাহ্ন বেলাতেই ঘটে থাকে। বৈশাখের প্রথম সাতদিনের যে কোন একদিন, তারপর প্রতি 8 দিন থেকে 10 দিনের ব্যবধানে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—এই দুই গ্রীষ্মের মাসে এই ঝড়ের আবির্ভাব ঘটে। কাল বৈশাখীর ঝড় গাঙ্গেয় পশ্চিম বঙ্গের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।* পৃথিবীর আর কোন অংশে কাল বৈশাখীর ঝড়ের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না।

এ প্রসঙ্গে আবহ-বিজ্ঞানের যে চারটি সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন তাদের নাম হল (১) ল্যাপস্ রেট (Lapse rate) (২) ড্রাই এডিয়াবেটিক ল্যাপস্ রেট (Dry Adiabatic Lapse rate) (৩) ওয়েট এডিয়াবেটিক ল্যাপস রেট (Wetadiabatic Lapse rate) (৪) কনভেকটিভ ইনস্টেবিলিটি (Convective instability)। বাস্তবিক পক্ষে উচ্চতার সঙ্গে বাতাসের তাপমাত্রার নিম্নমুখী তফাৎকেই ল্যাপস্ রেট বলে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, ভূপৃষ্ঠে বাতাসের তাপমাত্রা $35^{o}C$, 1000 মিটার উচ্চের তাপমাত্রা $24^{o}C$, 2000 মিটার উচ্চের তাপমাত্রা $13^{o}C$। সুতরাং উচ্চতায় 2000 মিটারের ব্যবধানে তাপমাত্রার তফাৎ হল $22^{o}C$। এখানে ল্যাপস রেট হল $11^{o}C$ প্রতি 1000 মিটারে।

প্রায় আদ্রতা বিহীন বায়ু হল শুষ্ক বায়ু। এক কিউবিক সেন্টিমিটার আয়তন-এর এই শুষ্ক বায়ু যখন উপরের উচ্চতায় যায় তখন এর তাপমাত্রা যে ল্যাপস রেটে কমে সেই ল্যাপস রেটকেই ড্রাই এডিয়াবেটিক ল্যাপস রেট বলে। এর মান হল $10^{o}C/1000$ মি.।

পূর্ণ-আদ্র বায়ু যখন ঘনীভবন লেভেল (Condensation level) থেকে উপরের দিকে উঠে তখন এই জলকণা ঘনীভূত বায়ু (এক কিউসেক আয়তন) এর তাপমাত্রা উপরের উচ্চতার সংগে যে ল্যাপস্ রেটে কমে সেই ল্যাপসরেটকেই ওয়েট এডিয়াবেটিক ল্যাপস রেট বলে। মনে কর ঘনীভবন লেভেল থেকে পূর্ণআদ্রবায়ু 1 কিমি. উপরের উচ্চতায় গেল তখন ঐ পূর্ণ-আদ্র বায়ুর ল্যাপট রেট হবে $6^{o}C/1000$ মি.।

ভূপৃষ্ঠের সন্নিহিত অঞ্চলের বায়ুর ল্যাপস রেট যদি ড্রাই এডিয়াবেটিক ল্যাপস রেট এর বেশি হয় তখন যে কোন বাতাসের স্তরটি ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হলে স্তরটি ঘনীভবন লেভেল পর্যন্ত ড্রাই এডিয়াবেটিক রেটে শীতল হবে, তার পর ঘনীভবন লেভেল উচ্চতার উপরে ওয়েট এডিয়াবেটিক ল্যাপস্ রেটে শীতল হবে। এখন ওই উৎক্ষিপ্ত বায়ুর চতুপার্শ্বস্থ বায়ুর ল্যাপস রেট যদি ওয়েট এডিয়াবেটিক ল্যাপস্ রেট থেকে বেশি হয় তাহলে ঐ জলে ঘনীভূত বায়ুস্তরটি অস্থির হয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর উচ্চতায় পৌঁছাবে। জলে ঘনীভূত বায়ুস্তরের এই অস্থিরতার নাম কনভেকটিভ্ ইনসষ্টেবিলিটি।

কালবৈশাখীর মেঘ ঃ নিম্নস্তরের মেঘগুলির মধ্যে যে মেঘটি আয়তনে সর্বাধিক বৃহৎ সেই মেঘটির নাম কিউমিলোনিম্বাস (Cumilonimbus)। এই মেঘগুলি দৈর্ঘে 10 থেকে 15 কিলোমিটার প্রস্থে 3 থেকে 5 কিলোমিটারের হয়। মেঘের তলদেশ ভূপৃষ্ঠ হতে মাত্র 450 মিটার (1500 ফুট) উপরে অবস্থিত হয়। এই মেঘের সর্বাপেক্ষা উপরের অংশের উচ্চতা ভূপৃষ্ঠ থেকে 7-9 কিমি.।

প্রায় সব কিউমিলোনিম্বাস মেঘের চূড়ায় একটি কামারের নেহাই (Anvil) আকারের একটি অংশ দেখতে পাওয়া যায়। এই মেঘের বৈশিষ্ট্যতা হল মেঘটির সর্বাপেক্ষা উপরের অংশ ছাড়া সব অংশই দ্রুত পরিবর্তনশীল। এই কিউমিলোনিম্বাস মেঘের নিম্নভাগে আর এক প্রকারের মেঘ

* সর্বক্ষেত্রেই কালবৈশাখীর ঝড় আকাশের উত্তর পশ্চিম দিক হইতে আবির্ভূত হয়।

* শান্তিনিকেতন, 18/E, দমদম রোড, কলিকাতা-700 030

দেখা যায়, যার নাম হল নিম্বোষ্ট্রেটাস (Nimbostratus)। সমগ্রভাবে এই মেঘের রং গভীর ধূসর বর্ণ।

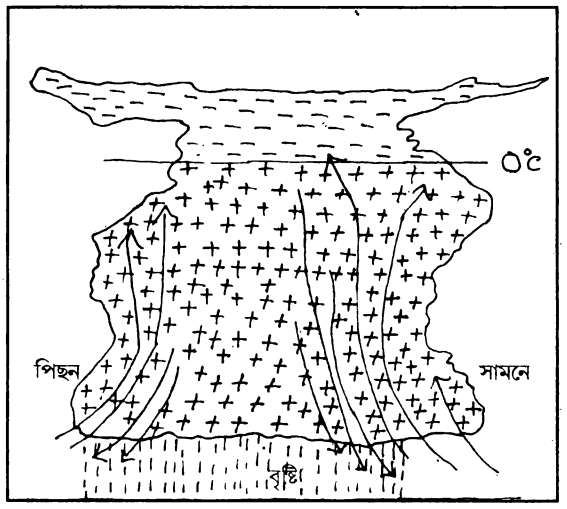

1নং চিত্র- একটি কিউমিলোনিম্বাস মেঘের প্রস্থচ্ছেদ।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই গ্রীষ্মের মাসের আবহাওয়ার তিনটি উপাদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হল রোদের তেজ দ্বিতীয়টি হল বাতাসের গতির অভাব, তৃতীয় উপাদানটি বায়ুর আদ্রতার উচ্চমূল্য — হিউমিডিটি শতকরা 40% বা তারও বেশি। রোদের প্রচণ্ড তাপে ভূমিতলের মাটির প্রথম কয়েক সেন্টিমিটারের উপরিস্থিত বায়ুর স্তর অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে লঘু হওয়ার জন্য প্রায় 300 মিটার উচ্চতায় উঠে যায়। এর সঙ্গে বায়ুর ল্যাপস রেট যেটা বায়ুর নীচের স্তরে ড্রাই এডিয়াবেটিক ল্যাপস্ রেট থেকে বেশি থাকার দরুণ উপরে উত্থিত বায়ু আরও উপরে উঠলে 450 মি. উচ্চতায় বায়বীয় জলকণার বা বায়ুর আদ্রতার ঘনীভবণ (Condensation) প্রক্রিয়া শুরু হয়। এখন এই ঘনীভবন স্তরের যেটা আমরা মেঘের তলদেশ বলে দেখতে পাই — উপরের বায়ুস্তরগুলিতে যদি তাপমাত্রার ল্যাপস রেট ওয়েট এডিয়াবেটিক ল্যাপস্ রেট এর থেকে বেশি হয় তা হলে কনভেকটিভ ইনস্টেবিলিটি অবস্থার উদ্ভব হয় এবং উত্থিত বাতাসে মেঘ তৈরি শুরু হয়। ঘনীভবন লেভেল হতে যে উচ্চতা পর্যন্ত কনভেকটিভ ইনসষ্টেবিলিটি অবস্থা চালু থাকে ততদূর উচ্চতা পর্যন্ত মেঘের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কনভেকটিভ ইন্সষ্টেবিলিটির জন্য মেঘের মধ্যেকার অস্থিরতা প্রচণ্ড আলোড়ন পূর্ণ হয়ে থাকে। মেঘের জলকণাগুলির ঊর্ধ্বমুখী গতি প্রতি সেকেণ্ডে 20 সেমি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রচণ্ড আলোড়নের মুখে জলকণাগুলি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং মেঘের মধ্যে দুই প্রকার বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। উভয় দিকের বিদ্যুৎএর ভোলটেজ (Voltage) 1,00000 ভোল্টে পৌছালে বিদ্যুৎএর ডিসচার্জ হয়। তখন আমরা বিদ্যুৎ চমকান দেখিতে পাই। বিদ্যুৎ চমকানির আলো দেখবার 6 সেকেণ্ড পরে বজ্রধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

ভূপৃষ্ঠ থেকে কিউমিলোনিম্বাস মেঘের ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য করলে মেঘের মধ্যেকার প্রচণ্ড আলোড়ন স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এই আলোড়নের জন্য মেঘের ঊর্ধ্বমুখী গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নমুখী গতিবেগ ও দেখতে পাওয়া যায়। এই নিম্নমুখী গতিবেগ বিশিষ্ট বায়ুপ্রবাহই কাল বৈশাখীর ঝড় রূপে ভূপৃষ্ঠে প্রকাশ পায়। এই ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় 50 কিমি থেকে 100 কিমি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। ঝড় বয়ে যাবার সময় 4 থেকে ৪মিনিটের বেশি হয় না। ঝড় বয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বৃষ্টিপাতের সময় 30 মিনিট থেকে 40 মিনিট পর্যন্ত হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাত শেষ হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়। ভূপৃষ্ট ও তদুপরি বায়ুস্তর শীতল হয়। এককথায় আবহাওয়া বিশেষভাবে মনোরম হয়।

একটি ক্রিয়াশীল কাল বৈশাখীর মেঘের প্রস্থচ্ছেদ (Cross-section) এর চিত্র (চিত্র নং 2) নীচে দেওয়া হল।

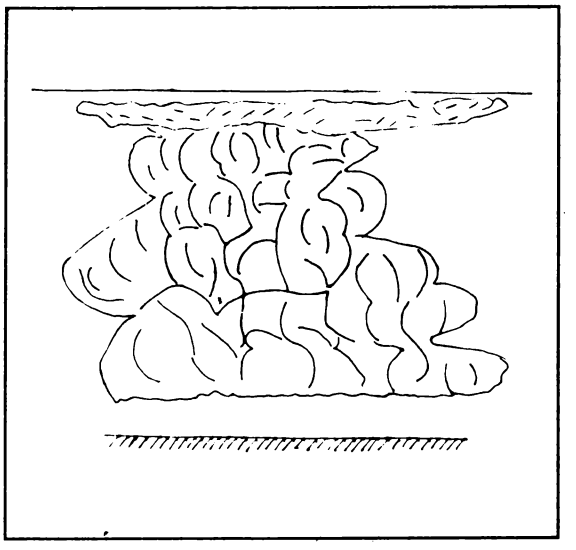

2নং চিত্র কিউমিলোনিম্বাস মেঘ

তীব্র গতিবেগ বিশিষ্ট কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে যাবার পর জীবন ও সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হয়। বজ্রাঘাতে 2/4টি প্রাণ নষ্ট হয়েছে। শহরাঞ্চলে জরাজীর্ণ পাকাবাড়ী বা টিন নির্মিত বাড়ী এই ঝড়ের প্রকোপে ভেঙ্গে পড়ে। গ্রামাঞ্চলে

কালবৈশাখীর ঝড়ের প্রভাবে অনেক সময় হাইটেনশন বিদ্যুৎ-এর টাওয়ার ভেঙে যায়। উঁচু গাছ — যথা তাল, পাম ইত্যাদি ভেঙ্গে পড়ে কিংবা অনেক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড গাছ সমূলে উৎপাটিত হয়ে ভূতলশায়ী হয়। টিনের ও খড়ের ছাদবিশিষ্ট ঘরগুলির প্রভূত ক্ষতি হয়।

কালবৈশাখীর ঝড়ের মধ্যে বিমান পরিচালনা বিশেষ বিপদসংকুল কাজ। সেজন্য বিমানের গতির দিক পরিবর্তন করে সর্বক্ষেত্রে কালবৈশাখীর ঝড়ের মেঘকে এড়িয়ে যাওয়াই পাইলটরা প্রকৃষ্ট পন্থা বলে গ্রহণ করে। অতর্কিতভাবে ঝড়ের মেঘের মধ্যে বিমান পড়ে গেলে মেঘের অস্থিরতা বিমানের বিভিন্ন অঙ্গের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে উড়ন্ত বিমান পাইলটের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন বিমানটি ভেঙ্গে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে দুটি বিমান দুর্ঘটনার বিবরণ দিলে কালবৈশাখীর মেঘ বিমানের পক্ষে কি ভয়াবহ তা বুঝতে পারা যাবে। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে কলিকাতা (দমদম) বিমানবন্দরের অনতিদূরে। ব্রিটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ করপোরেশনের চারইঞ্জিন বিশিষ্ট একটি যাত্রীবাহী ব্রিটানীয়া বিমান হল ঐই অভিশপ্ত বিমান। 100 জন যাত্রী নিয়ে এই বিমান বৈশাখ মাসের চতুর্থ সপ্তাহের এক অপরাহ্নে সাড়ে চারটার সময় করাচী অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। বিমানটি রানওয়ে থেকে টেক্ অফ (Take off) করে পশ্চিমদিকে করাচীগামী হয়। টেক অফ করার 3 মিনিটের মধ্যেই প্লেনটির সঙ্গে কণ্ট্রোল টাওয়ার-এর রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিমানটি একটি অতিকায় কালবৈশাখীর ঝড়ের মধ্যে গিয়ে পড়ে। বিমানটির বডি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে উলুবেড়িয়ায় নিকটবর্তী এক ধানের ক্ষেত এর উন্মুক্ত এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পড়ে থাকতে দেখা যায়। 100 জন যাত্রীর মধ্যে 80জনের মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়েছিল। 20 জন যাত্রীকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি ডাকোটা বিমানকে কেন্দ্র করে। বিমানটি ব্যারাকপুর এয়ারপোর্ট থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের একদিনের অপরাহ্ন 5 টায় টেক অফ করে গন্তব্য-স্থানে দিল্লী যাবার জন্য ব্যারাকপুর দিল্লী রুটে বিমানের নির্দিষ্ট লেভেলে (Cruising level) উঠে দু-এক মিনিটের মধ্যেই একটি অপেক্ষাকৃত ছোট কালবৈশাখীর ঝড়ের মেঘের ভিতর চলে যায়। পাইলট বিমানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং বিমানটি ভেঙ্গে পড়ে। পরের দিন সকালে ব্যারাকপুর থেকে 45 কিমি. উত্তর পশ্চিমে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে ডেকোটা বিমানটির ভগ্নাংশগুলি বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বিমানের পাইলট সমেত ছয় আরোহীর মৃতদেহও ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

এবার কালবৈশাখীর ঝড়ের তীব্রতা নিয়ে দুচার কথা বলি। গত পাঁচশ বছরের কালের বিবর্তনে কালবৈশাখীর ঝড়ের তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। ইংরেজী পাঁচের দসকে একটি সাধারণ কালবৈশাখী ঝড়ের গতিবেগছিল ঘণ্টায় 70 কিমি. আর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল 25 মিমি.। সে জায়গায় বর্তমান নয়ের দশকে একটি সাধারণ কালবৈশাখীর ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় 55 কিমি. এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 15 মিমি.। এই তীব্রতা হ্রাসের কারণ খুঁজতে গিয়ে একটা জিনিষই আমাদের চোখে পড়ে, সেটা হল পৃথিবীব্যাপী আবহাওয়ার পরিবর্তন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি শক্তিধর জাতিগুলি বেশ কিছু সংখ্যক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এই বিস্ফোরণ গুলির রেডিওএকটিভ ছাই (Ash) আবহাওয়ার উপরের উচ্চতার বায়ুস্তরকে কুলুষিত করেছে। তার উপর আছে পৃথিবীব্যাপী শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসাবে বায়ু দূষণ (Airpollution) এসব দূষণই কালবৈশাখীর ঝড়ের তীব্রতা হ্রাসের পশ্চাতে রয়েছে বলে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

প্রকাশিত হলো

জ্যোর্তিবিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের

তারা চিনিবার সহজ উপায়

সম্পাদনা – রণতোষ চক্রবর্তী

মূল্য – ৩০

এক কাঠার জমিদার

তপনকুমার দোলুই*

সাত সকালে পাঁচুকে হন্ত দন্ত হয়ে যেতে দেখে বটতলায় উপস্থিত ছেলে, যুবা, মাঝবয়সী ও বৃদ্ধ সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল "ভায়া ! অমন তড়িঘড়ি করে চললে কোথায় ?" অমনি পাঁচু উত্তর দিল "আমার এখন নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। আমার ট্যাড়স বাগানের সব গাছ মরতে বসেছে। তাই হাটপাড়া যাচ্ছি, একটা ওষুধের শিশি কিনে আনি, দেখি গাছ বাঁচাতে পারি কিনা।" সবাই মিলে আলোচনা করতে লাগলেন কীটনাশকের ব্যায়ভার বহন করা গরীব চাষীদের সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। অথচ ঔষধ না দিলে নয়। ঠিক সেই সময় হেঁটে যাচ্ছিলেন বিবেকবাবু। আব্দুলচাচা ওনাকে ডেকে বললেন "শুনুন মশায় আমরা বিরাট সমস্যায় পড়ে গেছি। কীটনাশক কিনে কিনে দেউলিয়া হয়ে গেলাম অথচ আপনি তো বিনা ঔষধ প্রয়োগে চাষ তো ভালই করে চলেছেন। দয়া করে বলুন উপায়টা কি।" সব শুনে তো বিবেকবাবু হেসে বললেন "আমি হলাম এক কাঠার জমিদার। আমার কথা ছেড়ে দিন।" এরপর উনি যা বললেন তা হল—

অস্বাভাবিক অবস্থাযুক্ত উদ্ভিদকে রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ বলে। রোগ সৃষ্টি করতে পারে দুটি উপাদান প্রথমতঃ প্রাকৃতিক, দ্বিতীয়তঃ জীবাণু আলাদা আলাদাভাবে বা একসঙ্গে।

রোগ দমন বলতে একটি দুটি গাছের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয় জমির পুরো ফসলের বা নির্দিষ্ট এলাকার ফসলের রক্ষাকে বোঝায়।

রোগ দমন নানা উপায়ে হয়। তবে রোগ প্রতিরোধের দিকে বেশি নজর দিতে হবে তাহলে অযথা কীটনাশক প্রয়োগ না করেও আমরা ভালভাবে ফসল তুলে নিতে পারি। রোগ দমনের উপায়গুলি হল—

প্রথমতঃ রোগ জীবাণু পরিহারঃ—(i) ভৌগোলিক এলাকা নির্বাচন (ii) সঠিক জমি নির্বাচন (iii) বীজ বপনের সঠিক সময় নির্বাচন (iv) রোগ এড়ানো সঠিক ভ্যারাইটির নির্বাচন (v) বীজ ও অন্যান্য বংশবিস্তারকারি অঙ্গের নির্বাচন (vi) চলতি (চাষে) প্রথার রোধ।

দ্বিতীয়তঃ রোগজীবাণু প্রতিরোধ ঃ— উপরোক্ত ব্যাবস্থাগুলি নেওয়া সত্ত্বেও যদি রোগ জীবাণু থেকে যায়, তখন এইসব নিতে হয়—(i) বীজ শোধন (তাপ, গ্যাস ইত্যাদি) (ii) তদারকি ও সুস্থতার তকমা (iii) কোয়াবেনটাইন (আক্রান্ত এলাকা থেকে যাতে না রোগ ছড়িয়ে পড়ে) (iv) বাহক পতঙ্গ নির্মূলকরণ (v) পোষকের পুষ্টির পরিবর্তন (vi) পোষকের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি।

তৃতীয়তঃ রোগজীবাণু নির্মূলকরণ ঃ—উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও রোগজীবাণু শস্যের ক্ষতি করতে পারে তখন এই ব্যবস্থাগুলি নেওয়া যেতে পারে—(i) **জৈব নিয়ন্ত্রণ**—এই ব্যবস্থায় সাধারণতঃ একজীব (বন্ধু) দিয়ে অন্য অনিষ্টকারী জীবের ধ্বংস সাধন করা হয়। যেমন শস্যের ক্ষেতে মাকড়সার জালে যখন অপকারী পতঙ্গ ধরা পড়ে তখন মাকড়সা উপকারী জীব হিসাবে কাজ করে।

যখন ধানের জমিতে লেদা পোকা বা গান্ধী পোকার প্রকোপ বাড়ে তখন জমিতে গাছের ডাল পুঁতে দিলে পাখি এসে বসে ও ঐ সব পোকা বা তার লার্ভা খেয়ে নেয়। নিমাটোড (আণুবীক্ষনিক গোলকৃমি যারা শস্যের নানা রোগ সৃষ্টিকরে) ধ্বংস করতে ভক্ষণকারী ছত্রাক জমির মাটির সঙ্গে মিশিয়ে প্রভূত সাফল্য পাওয়া গেছে।

(ii) **শস্য পর্যায়**—(জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষ)।

(ii) **স্বাস্থ্য বিধান**—(রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ এবং পরিবর্ত কোন পোষক থাকলে সরিয়ে ফেলা বা ধ্বংস করা)।

(iv) **মাটি শোধন**—(জমিকে খোলা রেখে দিলে সূর্যালোকের প্রভাবে বা গাছের পাতা বা খড় জ্বালিয়ে জীবাণু মুক্ত করা যায়)।

রুগ্ন উদ্ভিদ নিরাময় ঃ সর্বক্ষেত্রে না হলে ও কোন কোন শস্য ও ফলদায়ক উদ্ভিদে ভৌতিক ও রাসায়নিক নিরাময় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়—

(1) **হিট থেরাপি ঃ** তাপ প্রয়োগ করে বিশেষতঃ মূল থেকে নিমাটোড মারার জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

(2) **ট্রি সার্জারি ঃ** বড় বড় গাছের আক্রান্ত শাখা-প্রসাখা কেটে বা রুগ্ন অঞ্চল চেঁছে ফেলা হয়। আপেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(3) **রাসায়নিক ঃ** রুগ্ন উদ্ভিদকলা থেকে রোগজীবাণু দূরীকরণে অ্যান্টিবায়োটিক ও নীমপাতার নির্যাস প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে।

উপরোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে কীটনাশকের খরচ বাঁচান যায় এবং পরিবেশ-দূষণও রোধ করা যায়।

* গ্রাম–ভাঁটাচক, পোঃ–আমদান, জেলা–মেদিনীপুর

মজার সংখ্যা নয়

সত্যরঞ্জন পাণ্ডা*

যে যোগফলে সর্ব বামের সংখ্যা ছাড়া সবই নয় আসে যখন যোজ্য রাশির সংখ্যা দু'জোড়া ঃ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9 সংখ্যাগুলি নিয়ে পর পর লিখে গেলে সংখ্যাটি হয় 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এবং এর উল্টান সংখ্যাটি হয় 9 8 7 6 5 4 3 2 1. এখন এই দুটি সংখ্যাকে বিশেষভাবে সাজিয়ে 7 7 7 7 7 7 7 7 9 সংখ্যাটি যোগ করলে যোগফলের সব সংখ্যাই 9 হবে। নিচের যোগফলটি দেখে কেবল একটু মিলিয়ে নাও। [এখানে সোজা ও উল্টান সংখ্যা নিয়ে এক জোড়া যোজ্য রাশি ধরা হয়েছে।]

```
  123456789 }
  987654321 }
  123456789 }
  987654321 }
  777777779
-------------
[2] 999999999
```

তা হলে দেখ যোলফলে সর্ব বামে 2 বাদে সব সংখ্যাই নয় হয়েছে। এখানে 1 থেকে 9 পর্যন্ত ও 9 থেকে 1 পর্যন্ত সবগুলি সংখ্যা নিয়ে দুজোড়া সংখ্যা যোগ করা হয়েছে। তাই সর্ববামে 2 আসছে। একে তাই ঘর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

যখন যোজ্য রাশির সংখ্যা তিন জোড়া ঃ

এবার দেখ যোজ্য রাশি যদি এরূপ তিন জোড়া সংখ্যা নেওয়া যায় তা হলে তার সঙ্গে যদি 6 6 6 6 6 6 6 6 9 যোগ করা যায় তাহলে সর্ববামে তিন আসবে এবং অপর সংখ্যাগুলি সবই 9 হবে। নিচের যোগফল মিলিয়ে নাও

```
  123456789 }
  987654321 }
  123456789 }
  987654321 }
  123456789 }
  987654321 }
  666666669
-------------
[3] 999999999
```

যোজ্য রাশি যখন চার জোড়া ঃ

আগে বলা হয়েছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এর সবগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে সব থেকে ছোট সংখ্যাটি হল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এবং সব থেকে বড় সংখ্যাটি হল 987654321. এই দুই সংখ্যাকে এক জোড়া সংখ্যা ধরা হয়েছে। এভাবে চার জোড়া সংখ্যা নিয়ে বিশেষ ভাবে সাজিয়ে তার সঙ্গে 5 5 5 5 5 5 5 5 9 যোগ করলে যোগফলের সব সংখ্যাই 9 হবে এবং সর্ব বামের সংখ্যাটি হবে 4. নিচের যোগটি দেখে মিলিয়ে নাও।

```
  123456789 }
  987654321 }
  123456789 }
  987654321 }
  123456789 }
  987654321 }
  123456789 }
  987654321 }
  555555559
-------------
[4] 999999999
```

এর থেকে নিয়মটি দেখ ঃ

(১) যোজ্য রাশি যত জোড়া নেওয়া হবে যোগফলের সর্ব বামের সংখ্যাও ঠিক তত বসাবে।

(২) সর্ব বামে যোজ্য রাশির সর্ব ডানের সংখ্যাটি 9 বসিয়ে তার বামে 9 থেকে যত জোড়া যোজ্য রাশি নেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা বাদ দিয়ে বাকি সব সংখ্যাগুলি বসাতে হবে।

মনে রাখবে এ জাতীয় সংখ্যার যোগফলে 9-এর সংখ্যা নয়টি হবে।

দেখ দেখি এভাবে যোজ্যরাশি পাঁচ জোড়া, ছয় জোড়া নিয়ে এই বিশেষ সংখ্যা আগের নিয়মে বার করে এরূপ যোগফল পাওয়া যাবে কিনা !

বল দেখি যখন যোজ্য রাশির সংখ্যা দশ জোড়া হবে তখন সর্বশেষ যোজ্য রাশি কত নিয়ে এরূপ যোগফল পাওয়া যাবে ?

* 1নং ভোলা ময়রা লেন, কলিকাতা-700 004

যে যোগফলে সবই নয় আসে ঃ

1 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যা নিয়ে নিচের মত সাজান হয়। অবশ্য যোজ্য রাশিতে আগের মত চার জোড়া সংখ্যা আছে। শেষ লাইনে শুধু মাত্র 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 বসিয়ে যোগ করলে যোগফলটি হবে 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9. নিচের শূন্যস্থান পূরণ করে যোগফলটি মিলিয়ে নাও।

```
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 }
  9 8 7 6 5 4 3 2 1 }
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 }
  9 8 7 6 5 4 3 2 1 }
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 }
  9 8 7 6 5 4 3 2 1 }
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 }
  9 8 7 6 5 4 3 2 1 }
    *       *     *
---------------------
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
```

দেখ দেখি এ জাতীয় তিন জোড়া সংখ্যা নিয়ে বিশেষ কোন সংখ্যা যোগ করে যোগফলে সবই 9 পাওয়া যায় কিনা।

বর্গ না করে বর্গ ফল ঃ

কোন সংখ্যাকে যে সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় সেটিকে যে কোন একটি সংখ্যার বর্গফল বলা হয়। এই বর্গফল নিয়ে 9-এর ভূমিকা কম নেই। এখানে যে সব সংখ্যার অঙ্কগুলি সবই 9 তাদের বর্গ নির্ণয়ে বেশ মজার ব্যাপার আছে। আগে নিচের ফলগুলি দেখ।

$9 \times 9 = (9)^2 = 81$

$99 \times 99 = (99)^2 = 9801$

$999 \times 999 = (999)^2 = 998001$

$9999 \times 9999 = (9999)^2 = 99980001$

$99999 \times 99999 = (99999)^2 = 9999800001$

$999999 \times 999999 = (999999)^2 = 999998000001$

এভাবে লিখে গেলে তো শুধু চলবে না, তারজন্য নিয়মটিও জানার দরকার।

নিয়মটি দেখ(i) 9, 99, 999, --- ইত্যাদি সংখ্যার যদি বর্গফল নির্ণয় করতে হয় প্রথমে দুটি সংখ্যা 8 ও 1 লিখে নেবে।

(ii) এবার গুণক বা গুণ্যে যদি N সংখ্যক 9 থাকে তাহলে ঐ 8-এর আগে (N–1) সংখ্যক 9 এবং 8 এর পরেও 1-এর আগে (N–1) সংখ্যক শূন্য (0) বসাবে।

দেখ দেখি এই নিয়মে $(99999999)^2$-এর বর্গফল পাওয়া যায় কিনা !

9-গুণ ও যোগের বিচিত্র জ্যামিতিক সাজ ঃ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – সংখ্যাগুলিকে নিয়ে এদের দ্বারা উৎপন্ন বিভিন্ন সংখ্যাগুলিকে বিভিন্ন জ্যামিতিক চিত্রের মত সাজিয়ে 9-এর কয়েকটি মজার কাণ্ড দেখান যেতে পারে। প্রথমে সংখ্যাগুলিকে বিশেষভাবে সাজিয়ে সমকোণী ত্রিভুজের আকার নিচের মত করা হয়।

চিত্র 1

এই বিচিত্র সাজের মধ্যে শূন্যের (0) কোন স্থান নেই। ABC সমকোণী ত্রিভুজটির সমকোণ স্থানে 9 এবং A ও B কোণে 1 এবং AC লম্ব ও BC ভূমি বরাবর 123456789 এবং অতিভুজ AB র সংলগ্ন সংখ্যাগুলি সবই 1 সংখ্যা আছে। এই ছবিকে আমরা ধরব সংখ্যা ত্রিভুজ, যার মধ্যে 1, 1 2, 1 2 3, ইত্যাদিকে বলবো যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সারি।

এই ত্রিভুজের প্রত্যেক সারির সঙ্গে 9 গুণ করলে যে সংখ্যা শ্রেণীটি আসবে তার আকার হবে ট্রাপিজিয়মের মত। নিচে এই আকারটি দেখান হল।

চিত্র 2

সংখ্যা ত্রিভুজের প্রত্যেক সারিতে 9 গুণ করলেই সর্বদা ABCD ট্রাপিজিয়ম আসবেই যার A B ও D C বাহু দুটি সমান্তরাল।

আবার 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 সংখ্যাগুলির সবগুলি এক সঙ্গে নিয়ে একটি আয়তক্ষেত্র গঠন করবো যাকে বলা হয় **সংখ্যার আয়তক্ষেত্র**। পাশের চিত্রে যেটি দেওয়া হল যার মধ্যে 1, 2, 3, ইত্যাদি সংখ্যাগুলি যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় - - - - সারিতে থাকবে। এখানে P Q R S আয়তক্ষেত্রের P Q বাহু B C বাহুর সাথে সর্বদা সমান ও সমান্তরাল হবে। শুধু তাই নয় এদের প্রত্যেকটির সারি একই লাইনে থাকবে।

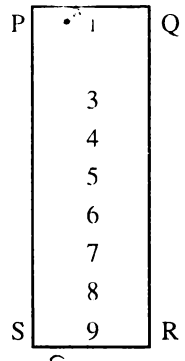

চিত্র 3

এবার এই সংখ্যা ট্রাপিজিয়মের পাশে যদি সংখ্যার আয়তক্ষেত্র যোগ করা যায় তাহলে তাদের ফল এক একটি মজার সংখ্যা শ্রেণী গঠন করবে তাদের আকারও ট্রাপিজিয়মের মত হবে। নিচের ছবিটি দেখ।

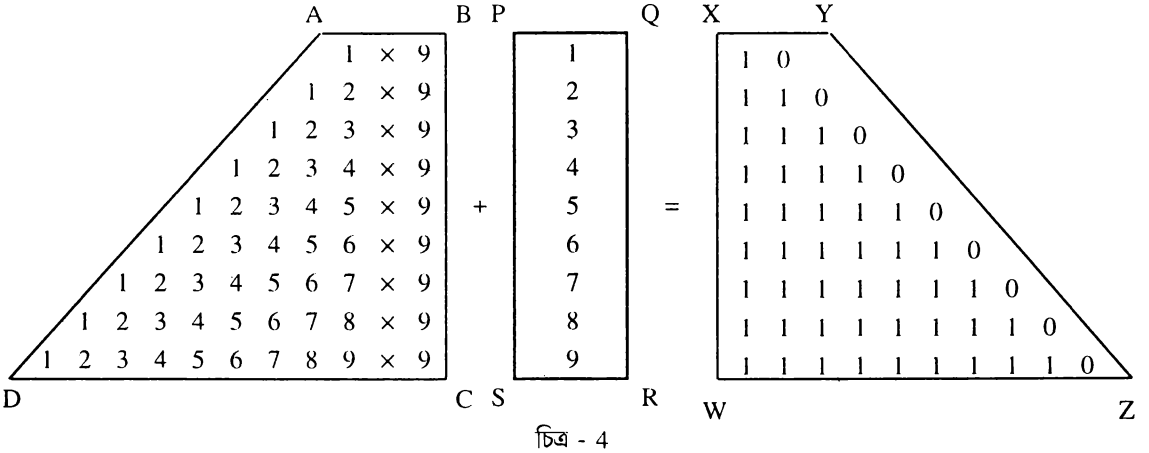

চিত্র - 4

লক্ষ্য কর বামের চিত্র দুটির সারির যোগফল অর্থাৎ $1 \times 9 + 1 = 10$, $12 \times 9 + 2 = 110$, $123 \times 9 + 3 = 1110$, ইত্যাদি সংখ্যার সারি ডান দিকে যথাক্রমে আছে। ডান দিকে প্রত্যেক সারির সংখ্যাতে 1 এবং একটি শূন্য (0) আছে। সারির সংখ্যার ওপর নির্ভর করছে 1 এর সংখ্যা। অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় - - - - - ইত্যাদি সারিতে যথাক্রমে একটি 1, 0 দুটি এক (1), তিনটি এক (1), ইত্যাদি আছে।

নয়-গুণ-যোগে সবই এক ঃ

সংখ্যার আয়তক্ষেত্র যদি 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 নিয়ে গঠন করা যায় তাহলে এক বিচিত্র সংখ্যার ট্রাপিজিয়ম পাওয়া যাবে যার প্রত্যেকটি সারিতে শুধু মাত্র 1 আসবে। নিচের চিত্রটি দেখ।

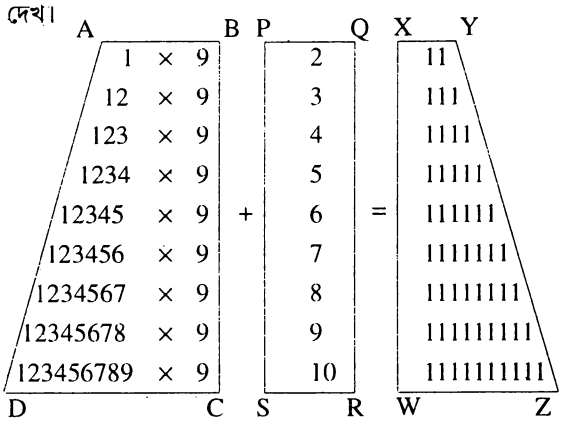

চিত্র-5

এখানে $1 \times 9 + 2 = 11$, $12 \times 9 + 3 = 111$, $123 \times 9 + 4 = 1111$, ইত্যাদি ভাবে কাজ করা হয়েছে। তাহলে XYZW ট্রাপিজিয়মটির মধ্যে খুব মজার সংখ্যা পাওয়া গেল তাই না ?

এবার ট্রাপিজিয়ম সংখ্যার নবম সারিটি বাদ দিয়ে এবং আয়তক্ষেত্র সংখ্যার 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 দিয়ে গঠন করে আগের মত যোগ করা যায়, তাহলে একটি ট্রাপিজিয়ম সংখ্যা পাওয়া যাবে যার সংখ্যা শ্রেণীটিও এক মজার হবে। পরের পাতায় চিত্রটি দেখ।

এখানে ডান দিকে ট্রাপিজিয়ম সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি সারিতে $1 \times 9 + 3 = 12$, $12 \times 9 + 4 = 112$, $123 \times 9 + 5 = 1112$ ইত্যাদি সংখ্যা সারি হয়েছে।

এখানে দেখ সংখ্যার আয়তক্ষেত্র থেকে 2 বাদ দিয়ে 3 দিয়ে শুরু করার ফলে ডান দিকে 2 এসে গেছে।

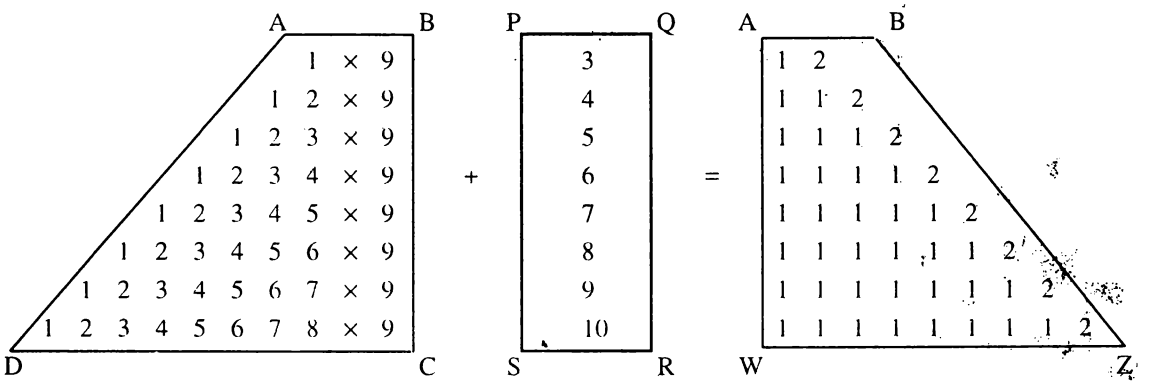

চিত্র-6

এবার যদি ট্রাপিজিয়ম সংখ্যার অষ্টম ও নবম সারি বাদ দিয়ে এবং আয়তক্ষেত্র সংখ্যাটি 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ইত্যাদি নিয়ে তৈরি করে আগের মত যোগ করা যায় তাহলে আর এক মজার ট্রাপিজিয়ম সংখ্যা পাওয়া যাবে। নিচের চিত্রটি দেখ।

1 হবে এবং ডান দিকে হবে 1 – 1 = 0, চিত্র 5-এ আয়তক্ষেত্রের সংখ্যা 2 থেকে শুরু বলে XYWZ ট্রাপিজিয়মের সব ক্ষেত্রে 1 হবে সর্বডানে হবে (2 – 1) = 1, চিত্র 6, এ PQRS-এ 3 থেকে সংখ্যা শুরু করার জন্য ডান দিকে প্রতিক্ষেত্রে 1 এবং

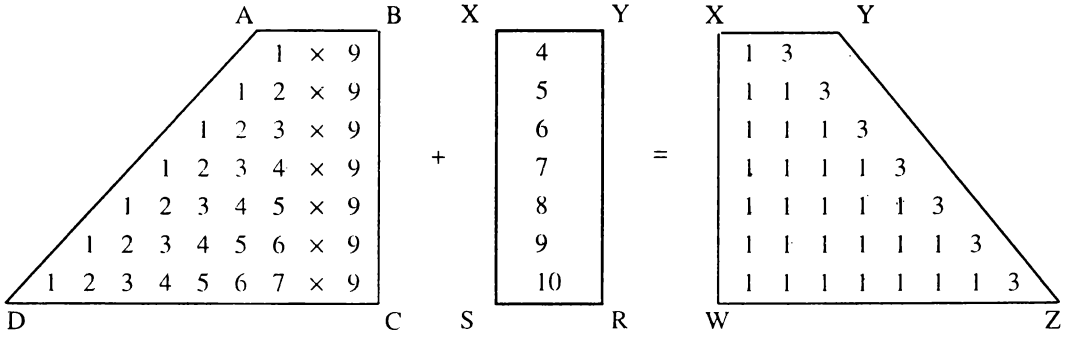

চিত্র-7

অর্থাৎ সংখ্যার আয়তক্ষেত্রটি 4 থেকে শুরু করে পর পর 10 পর্যন্ত নিয়ে গেলে ডান দিকে XYZW ট্রাপিজিয়মের সংখ্যা শ্রেণী যথাক্রমে 1 × 9 + 4 = 13, 12 × 9 + 5 = 113, ইত্যাদি হয়।

এইসব চিত্র থেকে ডান দিকের ট্রাপিজিয়মে কিরূপ সংখ্যা পাওয়া যাবে তার একটি নিয়মও দেওয়া যায়।

নিয়মটি দেখ ঃ চিত্র 4-এ আয়তক্ষেত্রের সংখ্যা শুরু হয়েছে 1 থেকে, তা হলে ডান দিকে XYZW ট্রাপিজিয়মে সব সংখ্যা

শেষে (3 – 1) = 2 এসেছে, অনুরূপে 4 থেকে শুরু করার জন্য এসেছে (4 – 1) = 3, তাহলে XYZW - এর প্রত্যেক সারিতে 1 হবে এবং ডান দিকে হবে আয়তক্ষেত্রের প্রথম সংখ্যার থেকে 1 কম।

দেখ দেখি – এ ভাবে HBCD ট্রাপিজিয়মের এক একটি শেষের লাইন কম করে ও ABCD আয়তক্ষেত্রের প্রথম সংখ্যা কমিয়ে XYZW-এর এভাবে সংখ্যা শ্রেণী পাওয়া যায় কিনা !

গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

প্রশ্ন ও উত্তর

জয়শ্রী দত্ত

১। এমন কোন জিনিস আছে যা একেবারে জ্বলে না ?

উঃ— জল কখনও জ্বলে না। কিন্তু জল কেন জ্বলে না কারণ আগুনে জ্বলে পুড়েই একটা গ্যাস তৈরি করে জল। ব্যাপারটা অনেকটাই কাগজ বা ঘুঁটে পুড়িয়ে ছাই-এর মতো। যখন হাইড্রোজেন গ্যাসকে অক্সিজেন নামে অন্য গ্যাসের উপস্থিতিতে জ্বালানো হয় তখনই হয় 'জল'। কাজেই জ্বলে পুড়ে ছাই হওয়ার মতো আমরা বলতেই পারি জ্বলে পুড়ে জল হয়ে গেলাম।

২। আলুভাজা আর ইস্ত্রী করা কাপড়ের মধ্যে মিল কোথায় ?

উঃ— আলুতে থাকে শ্বেতসার বা স্টার্চ। আলু ভাজলে বেশি তাপে আলুর শ্বেতসার গলে গিয়ে তৈরি করে একধরনের আঠা, অনেকটা গঁদের মতো, একে বলে ডেক্সট্রাইন (Dextrine)। এর জন্যেই আলুভাজা শক্ত হয়। আবার মাড় দেওয়া বা স্টার্চ দেওয়া কাপড়েও ইস্ত্রী করলে গরমে ঐ স্টার্চ ডেক্সট্রাইন হয়ে যায় ফলে ভাজা আলুর ওপরে যেমন শক্ত পর্দা পড়ে ঠিক তেমনি কাপড়েও তাই হয়।

এই দুটোর মিল তাহলে তৈরী হওয়া ডেক্সট্রাইনে। আলুভাজা একটু কোঁকড়ানো থাকে আর কাপড়টা ইস্ত্রীর চাপে হয়ে যায় সমান মসৃণ।

শ্বসন

অরিজিৎ দাস অধিকারী*

শ্বাষ-প্রশ্বাস কেমন করে
জীব দেহকে সচল করে
বলতে পার ভাই ?
ঐচ্ছিক পেশীর ক্রিয়ার ফলে
এই কাজটি সদাই চলে
তুমি কি জান নাই ?
মধ্যচ্ছদার সংকোচনে
এই পর্দা নিচে নামে
বক্ষগহ্বর দৈর্ঘ্যেতে বাড়ে।
পাঁজর পেশীর সংকোচন
বাড়িয়ে দেয় বক্ষ-স্থান
দ্বিতীয়তে বক্ষ বাড়ে আড়ে।
ফুসফুসের দৈর্ঘ্য বাড়ায়
প্লুরার চাপ কম হয়ে যায়
নভঃ বায়ুর থেকে,
বায়ুসমতা রাখতে গিয়ে
বায়ু নাসা পথ দিয়ে
ফুসফুসেতে মিশে।
অক্সিজেনকে রক্ত নেয়
কার্বনডাই অক্সাইড দিয়ে দেয়
ফুসফুসকে রাখে ভরিয়ে
সংঙ্কোচী পেশীর প্রসারণে
বক্ষগহ্বর কমে আয়তনে
দুষিত বায়ু যায় বেরিয়ে।
এমনি মজার কান্ড দ্বারা
শ্বাস-প্রশ্বাস চালাই মোরা
সারাটা জীবনে।
বুঝে নিও আজকেই
বুঝতে যেন ভুলোনাই
স্মরণ রেখো মনে।।

* প্রজ্ঞানন্দ সরকারী শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, বড়জা গুলীয়া, নদীয়া।

বিজ্ঞান সংবাদ

শৈবাল গুহ*

১। গাছেরা সরাসরি নাইট্রোজেন গ্যাস গ্রহণ করছে ?

উঃ শিম্বী গোত্রীয় উদ্ভিদের অর্বুদে বসবাসকারী রাইজোরিয়াম, অ্যাজোটোব্যাকটর, ক্লসট্রিডিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়াগুলি বাতাস থেকে N_2 গ্যাস গ্রহণ করে উদ্ভিদকে দেয়। অন্যান্য উদ্ভিদেরা মাটি থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। মাটিতে নাইট্রেট জাতীয় অজৈব লবণ থেকেই সাধারণতঃ তারা নাইট্রোজেন পায়। যে মাটিতে নাইট্রেটের পরিমাণ কম থাকে সেখানে সার দিতে হয়। নেচার পত্রিকা থেকে জানা গেছে, স্টুয়ার্ট চ্যাপিন নামক উদ্ভিদবিজ্ঞানী এমন একটি গাছের আবিষ্কার করেছেন যা সরাসরি জৈব নাইট্রোজেন নিতে পারে। গাছটির নাম এরিওফোরাম ভেজিনেটাম। ভীষণ শুষ্ক ও ঠাণ্ডা জায়গায় জন্মানোর ফলে গাছটির ওই স্বভাব বলে মনে করা হচ্ছে। চ্যাপিন মনে করেন সঠিক কারণ জানা গেলে বায়োটেকনোলজির সাহায্য নিলে অন্যান্য গাছও বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্যাস নিতে পারবে।

২। কেলস্ট্রেল পাখির আশ্চর্য দৃষ্টিশক্তি।

মানবচক্ষু সাধারণ আলোতে শুধু দেখতে পায়। অন্ধকারে বাদুড় শব্দোত্তর তরঙ্গের মাধ্যমে শিকার ধরে। কিছু সাপের মস্তকে এক প্রকার অঙ্গ থাকে যার থেকে ইনফ্রারেড তরঙ্গ বের হয়ে শিকারকে সনাক্ত করে এবং শিকার ধরে। 2রা ফেব্রুয়ারি 1995, নেচার পত্রিকা থেকে জানা গেছে ইউরোপীয় কেলস্ট্রেল পাখিরা অতি বেগুনী রশ্মি ব্যাবহার করে শিকার সনাক্ত করে এবং শিকার ধরে। কেলস্ট্রেল ফ্যালকন্ গোত্রের শিকারী পাখি। এরা আকাশে ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায় এবং শিকারের মূত্র ও মলের গন্ধ অতি বেগুনী রশ্মির সাহায্যে সনাক্ত করে শিকারের অবস্থান নির্ণয় করে এবং শিকার ধরে। এই ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণ করেছেন ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের য়েরকি করপ্লম্যাকি (Erkki korplmaki)।

* 5/3A, ওলাই চণ্ডী রোড, কলিকাতা-700 037

করে দেখ

অরিজিৎ দাস অধিকারী*

বিষয় ঃ জলছবি তৈরী

সোনাবন্ধুরা – দুর্গা পূজো বা অন্য সময় তোমরা নিশ্চয় দেখেছ তোমাদের ছোট ছোট সোনা বন্ধুদের কতছবি, মা দুর্গার কতো ছবি প্রতিটি সংবাদ পত্রে ছেপেছে। আচ্ছা বলোতো ঐ ছবিগুলো খুব সুন্দর নয় কি ? যদি তুমি ঐ ধরনের ছবি তোমার ড্রয়িং খাতা বা বই-এর উপরের পৃষ্ঠায় লাগাতে পারতে তবে কি ভালোই না হতো তাই না। কিন্তু কিভাবে ? কাগজ কাটলে তো বাড়ির বড়রা বকুনি আর ধমক দেন। তবে উপায় কি ?

চুপি চুপি এসো আজ আমরা কেমন করে খবরের কাগজের ছবি চুপিসারে নিজের ড্রয়িং খাতায় এঁকে নেব তা কেউ টের পাবেনা। আঁকা শুনে ভয় পাচ্ছ, ভাবছ অত সুন্দর আঁকব কি করে। শোননা এটা একটি পদ্ধতি যাতে খবরের কাগজে ঠিক যেমনটি ছবি আছে তেমনটি তোমার খাতার পাতায় উঠে যাবে।

একটি বাটি, একটুকরো সাবান কিছুটা তার্পিন তেল যোগাড় করে পছন্দমত খবরের কাগজের ছবি জোগার হলেই ব্যাস, কাজ শুরু। যারা তার্পিন তেল বলতে বুঝতে পারছনা তাদের বলি বাড়ির দরজা-জানালা রংকরার সময় রাজরা যে জলের মতো একটা জিনিস ব্যবহার করেন ওটাই তার্পিন তেল। তবে মাপের জন্য একটা চামচ (বিভিন্ন প্রকার O.R.S এর প্যাকেটে থাকে) ও পরিষ্কার জল হাতের কাছে রেখে কাজে বস।

প্রথমে 4 : 1 অনুপাত জল আর তার্পিন তেল মেশাও। অর্থাৎ চার চামচ জল নিয়ে তাতে এক চামচ তার্পিন তেল দিতে হবে। তবে তরলের পরিমাণ বাড়াতে গেলে উপযুক্ত হারে যেমন 2 চামচ তার্পিন তেলের জন্য 8 চামচ জল দিতে হবে। এবার ঐ মেশান তরলে একটুকরো সাবান ফেলে দাও। বেশকিছুটা সময় স্থির রেখে দাও। দেখ সাবানটা কেমন গলতে শুরু করেছে। টুকরো সাবানটা গলে গেলে ঐ মিশ্রণটিকে নিয়ে তোমার নির্বাচিত ছবির উপর তোমার ছবি আঁকা তুলির সাহায্যে একবার বুলিয়ে নিয়েই ছবিটাকে যে কাগজে তুলতে চাও তাতে ফেলে দিয়ে একটু হাত দিয়ে ঘসে তুলে নাও।

দেখ কেমন একটা সুন্দর ছবি তোমার খাতাতে উঠে গেল অথচ কাগজের ছবিটাও নষ্ট হল না। এমনিভাবে তোমরা তোমাদের প্রিয় ছবিগুলোকে খবরের কাগজ থেকে না কেটে তুলে নিতে পার। হাঁ কেমন ছবি তুললে তার দু-একটা পাঠাতে ভুল না।

* প্রজ্ঞানন্দ সরকারী শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, বড়জা গুলিয়া, নদীয়া

চিঠিপত্র

মহাশয়,

অক্টোবর সংখ্যায় জয়ন্ত বসুর **নোবেল পুরস্কারজয়ী হান্স আল্‌ফ্‌ভেন স্মরণে** রচনাটি মন দিয়ে পড়লাম। আল্‌ফ্‌ভেন এই শতাব্দীর নাম করা বিজ্ঞানীদের অন্যতম, তাঁর সৃষ্টির নানা দিক আছে যার মধ্যে কয়েকটি বিজ্ঞানের জগতে নতুন ধারা তৈরি করেছে। দুঃখের কথা, আল্‌ফ্‌ভেনের জীবনাবসানের পর তাঁকে নিয়ে ভারতের গণমাধ্যম তো বটেই এমনকি বিজ্ঞানের পত্রিকাগুলি তেমন আলোচনা করেনি। সেদিক থেকে আপনাদের প্রয়াস ধন্যবাদার্হ।

জয়ন্ত বসুর রচনাটি সর্বাঙ্গসুন্দর. আল্‌ফভেনের জীবনের অনেক প্রসঙ্গই আছে, তবে বিপরীত বিশ্ব সম্পর্কে আরও কিছু লেখার সুযোগ আছে। হয়তো পত্রিকার স্থানাভাব বিবেচনা করে জয়ন্তবাবু কলমকে সংযত করেছেন। পদার্থ ও বিপরীত পদার্থ দিয়ে গঠিত দুই বিশ্বের মাঝে উচ্চ তাপে শক্তির ব্যবধান, আল্‌ফ্‌ভেনের এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলেও একদা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল। ষাটের দশকে তিনি এ নিয়ে অনেক লিখেছেন। তার মধ্যে Worlds Anti Worlds বইটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাছাড়া সে সময় তিনি Scientific American পত্রিকায় কতগুলি লোকপ্রিয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিপরীত পদার্থ সমন্বিত বিশ্ব যেমন বিজ্ঞানী সমাজকে ভাবিয়েছে তেমনি কল্পবিজ্ঞান লেখকদের উদ্দীপিত করেছে। বস্তুতপক্ষে, ইউরোপ আমেরিকায় বিপরীত বিশ্ব, বিপরীত মানুষ ইত্যাদি দিয়ে গাদা গাদা কল্পবিজ্ঞান সে সময় লেখা হয়েছিল। বিপরীত বিশ্ব সংক্রান্ত প্রকল্পটির মূল প্রবক্তা ছিলেন আর এক সুইডিশ পদার্থবিদ, অস্কার ক্লেইন (Oskar Klein)। 1932 খৃস্টাব্দে পজিট্রন আবিষ্কার হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা বিপরীত প্রোটন, বিপরীত হাইড্রোজেন, এমনকি বিপরীত ইউরেনিয়াম, শেষে বিপরীত বিশ্ব কল্পনা করতে শুরু করেন। এর মধ্যে কয়েকটাকে আবিষ্কার বা তৈরি করা গেলেও শেষ পর্যন্ত এগোনো যায়নি, তবে তাত্ত্বিক দিক থেকে বিপরীত পদার্থ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। বাধা শুধু এই যে পদার্থ ও বিপরীত পদার্থ একত্রে থাকতে পারে না, তাদের মুখোমুখি হওয়া মানেই পারস্পরিক ধ্বংস ও গামা রশ্মির সৃষ্টি।

আল্‌ফ্‌ভেন বা ক্লেইন প্রস্তাবিত দুই বিশ্ব যদিও হয়েল প্রস্তাবিত Steady State Universe তত্ত্ব বা Big Bang Theory এর সঙ্গে খাপ খায় না তাই বলে ওঁদের তত্ত্বে কোন সারবত্তা নেই তা বলা যাবে না। ক্লেইন মনে করেন, আদিতে খুব পাতলা প্লাজমার মেঘ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিল ; এতে ছিল প্রোটন, অ্যান্টিপ্রোটন, ইলেকট্রন, পজিট্রন কণা প্রভৃতি। প্লাজমার মেঘের ব্যাসার্দ্ধ ছিল ট্রিলিয়ন (10^{12}) আলোবছর, দশ লক্ষ কিউবিক মিটার আয়তনে ছিল একটি কণা। স্বভাবতই কণাদের সংঘর্ষ ছিল অকল্পনীয়। মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে ক্রমে এই মেঘ সংকুচিত হতে থাকে। যখন মেঘের আয়তন কয়েক বিলিয়ন (10^9) আলোকবছরে পৌছয় তখন একটি-দুটি কণা ও বিপরীত কণায় সংঘর্ষ শুরু হয়, এতে গামা রশ্মির জন্ম হয় এবং ক্রমে রশ্মিজনিত চাপ বাড়তে থাকে। আরও সময় গেলে একটা অবস্থা আসে যখন রশ্মিজনিত চাপ ও মহাকর্ষীয় আকর্ষণ সমান হয়ে একটি সাম্যাবস্থা তৈরী হয়। আল্‌ফ্‌ভেন বলেন, আদি প্লাজমা মেঘে (ambiplasma) যে চৌম্বক ক্ষেত্র আছে তার এবং মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সমস্ত প্রোটন ও ইলেকট্রন এক দিকে ও সমস্ত অ্যান্টিপ্রোটন ও পজিট্রন অন্যদিকে জড়ো হতে থাকে, এ যেন অনেকটা তড়িৎ বিশ্লেষণের মতো। ক্রমে একদিকে যায় পদার্থ, অন্যদিকে বিপরীত পদার্থ। এই দুই জগৎকে আলাদা করে রাখে তাদের কিয়দাংশের ধ্বংসজাত রশ্মির বা শক্তির চাপ। সতত ধ্বংসের ফলে জাত এক উচ্চ শক্তির পর্দা দুই বিশ্বকে আলাদা করে রাখে।

দুঃখের কথাই বিপরীত বিশ্বকে চোখে বা দূরবীণে দেখে সনাক্ত করা যায় না। তাদের পদার্থ চরিত্র স্বাভাবিক পদার্থের মতো। তবে প্লাজমা মেঘ বা ambiplasma কে রেডিও দূরবীণ দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব। কিন্তু কোন কিছুই প্রমাণিত হয়নি। তাই বিপরীত বিশ্ব এখনও রয়ে গেছে কল্পবিজ্ঞানের পাতায় পাতায়।

সু র জি ৎ সে ন গু প্ত (বর্ধমান)

প্রকৃতি পড়ুয়ার পাঠশালা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কার্যালয়

প্রতি ইংরেজী মাসের দ্বিতীয় শনিবার বিকাল সাড়ে চারটেয়

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে জগবন্ধু পাত্র পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন ঃ 555-8417 থেকে প্রকাশিত এবং শৈলী 4A মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা-54 কর্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সাদা-কালো ফটোগ্রাফি প্রশিক্ষণ (বেসিক কোর্স)

(ক্লাশ — প্রতি সোমবার)
বেলা 3টা থেকে 5টা এবং সন্ধ্যা 6টা থেকে 8টা
প্রশিক্ষণ মেয়াদ ছয় মাস

সাদা-কালো টি. ভি. সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ

(ক্লাস — প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার)
সন্ধ্যা 6টা থেকে 8টা
প্রশিক্ষণ মেয়াদ এক বৎসর

⁂

রেডিও-টেপ-ইমারজেন্সিলাইট-এ্যামপ্লিফায়ার তৈরির প্রশিক্ষণ

(ক্লাশ — প্রতি শুক্রবার ও শনিবার 6টা থেকে 8টা)
প্রশিক্ষণ মেয়াদ এক বৎসর

⁂

যোগ থেরাপি প্রশিক্ষণ

প্রতি শনিবার 3টা থেকে 4টা
এক বৎসরের কোর্স
(জানুয়ারী – ডিসেম্বর)

⁂

ফটোগ্রাফি অ্যাডভান্স কোর্স

(ক্লাস — প্রতি শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যা 6টা থেকে 8টা)
প্রশিক্ষণ মেয়াদ এক বৎসর

মেডিক্যাল ল্যাবরেটরী টেকনোলজী প্রশিক্ষণ

ক্লাস — সপ্তাহে দু দিন
প্রশিক্ষণ মেয়াদ এক বৎসর

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন
কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রিট
কলিকাতা – 700 006
ফোন ঃ 555-8417

JNAN-O-BIJNAN | Registration No. R. N. 8659/57 Postal Regd. WB/NC-210 | FEBRUARY 1996

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কর্তৃক প্রকাশিত

সাগর-প্রাণী
রতনলাল ব্রহ্মচারী
ও
গোপালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী
মূল্য ঃ 28 টাকা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন
(*জন্মশত বার্ষিকী সংস্করণ*)
মূল্য ঃ 100 টাকা

কৃত্রিম সূর্য (টোকাম্যাক)
(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
দ্বিতীয় সংস্করণ)
জয়ন্ত বসু
মূল্য ঃ 8 টাকা

বোস সংখ্যায়ন
(*পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ*)
মহাদেব দত্ত
মূল্য ঃ 10 টাকা

লুই পাস্তুর
সমরেন্দ্রনাথ দাস
মূল্য ঃ 15 টাকা

প্রকাশিত হল
তারা চিনিবার সহজ উপায়
রাধাগোবিন্দ চন্দ্র
সম্পাদনা
রণতোষ চক্রবর্তী
মূল্য ঃ 30 টাকা

কলকাতা,
তিনশ বছরের বিজ্ঞানচর্চা
অপরাজিত বসু
মূল্য ঃ 35 টাকা

প্রকৃতি-বিজ্ঞানী
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
রণতোষ চক্রবর্তী
মূল্য ঃ 15 টাকা

রুচি রন্ধন পুষ্টি
হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
মূল্য ঃ 8 টাকা

ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ
(পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ)
দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী
মূল্য ঃ 10 টাকা

রোগ ও তাহার প্রতিকার
(2য় সংস্করণ)
অমিয়কুমার মজুমদার
মূল্য ঃ 15 টাকা

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006, ফোন-555-8417

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ 2, সূর্য সেন স্ট্রীট কলিকাতা-12	উষা পাবলিশিং হাউস 13/1, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-73	নাথ ব্রাদার্স 9, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-73

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা 60 টাকা

বিক্রেতা
পাত্র বুক ষ্টল
9, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-73

প্রচ্ছদ মুদ্রণ — শৈলী, কলিকাতা-৫৪

মূল্য—১০ টাকা